শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর

(তত্ত্বাংশ)

শ্রীকৃষ্ণরূপে ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে স্বয়ং ভগবানের লীলা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রসিকশেখর **স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র** স্বয়ংরূপে, অসংখ্য ভগবৎ-স্বরূপরূপে এবং অসংখ্য পরিকররূপেও লীলারস আস্বাদন করিতেছেন।

স্বয়ংরূপেও তিনি আবার দুই প্রকাশে লীলারস আস্বাদন করিতেছেন—ব্রজে বা বৃন্দাবনে ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে এবং নবদ্বীপে শচীনন্দনরূপে। এই উভয় ধামই নিত্য এবং উভয় লীলাও নিত্য।

স্বয়ংভগবান্ সম্বন্ধে শ্রীল রামানন্দরায় বলিয়াছেন—"নানাভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়। সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয় ॥২।৮।১১১॥" অখিল-রসামৃত-বারিধি স্বয়ং ভগবান্ অনন্ত-রসের আশ্রয় এবং বিষয়ও বটেন। কিন্তু তাঁহার একই প্রকাশে বিষয়ত্বের এবং আশ্রয়ত্বের বিকাশ সমান নয়; রসবৈচিত্রীর পরিপুষ্টি সাধনার্থই এই পার্থক্য। প্রেমের চরম-তম বিকাশ মাদনাখ্য-মহাভাব একমাত্র শ্রীরাধাতে বর্ত্তমান; শ্রীরাধা এই প্রেমের একমাত্র আশ্রয়। আর শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমের কেবলমাত্র বিষয়; আশ্রয় নহেন। মাদনাখ্য-মহাভাব সম্বন্ধে একথা ব্রজেন্দ্রনন্দন নিজ মুখেই প্রকাশ করিয়াছেন। "সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়। সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়॥ ১।৪।১১৪॥" ইহা হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা গেল, স্বয়ংভগবানের ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপে বিষয়ত্বের প্রাধান্য। আর তাঁহার শচীনন্দন-স্বরূপে আশ্রয়ত্বের প্রাধান্য; এই স্বরূপে তিনি শ্রীরাধার মাদনাখ্য-ভাবের আশ্রয়ও বটেন।

রসের আস্বাদন বিষয়-রূপেও হইতে পারে এবং আশ্রয়রূপেও হইতে পারে। উভয়রূপের আস্বাদনেই লীলারসাস্বাদনের পূর্ণতা—সুতরাং রসিক-শেখরত্বেরও পূর্ণতা। ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপে ব্রজে যে লীলারস আস্বাদন করেন, তাহাতে তাঁহার বিষয়রূপের আস্বাদনই প্রাধান্য লাভ করে। আর শ্রীশচীনন্দন গৌরসুন্দররূপে নবদ্বীপে তিনি যে লীলারস আস্বাদন করেন, তাহাতে তাঁহার আশ্রয়রূপের আস্বাদনই প্রাধান্য লাভ করে। সুতরাং ব্রজলীলা এবং নবদ্বীপলীলা—এই উভয়-লীলার সমবায়েই স্বয়ংভগবানের লীলার পূর্ণতা এবং উভয়-ধামের লীলারসাস্বাদনেই রসাস্বাদনেরও পূর্ণতা এবং তাঁহার রসিক-শেখরত্বেরও পূর্ণতম বিকাশ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে লীলা দুই রকমের—প্রকট এবং অপ্রকট। রসিক-শেখর স্বয়ংভগবান্—ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপেও প্রকট এবং অপ্রকট উভয় ধামেই লীলা করিয়া থাকেন এবং শচীনন্দন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপেও প্রকট এবং অপ্রকট উভয় ধামেই লীলা করিয়া থাকেন। কৃপা করিয়া তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকটিত করেন, তখনই জগতের জীবের পক্ষে তাঁহার লীলাতত্ত্বাদি কিছু কিছু জানিবার সুযোগ হয়।

স্বয়ংভগবানের লীলা-প্রকটনের সাধারণ নিয়ম হইতেছে এই যে—"ব্রহ্মার এক দিনে তিহোঁ একবার। অবতীর্ণ হৈয়া করেন প্রকট বিহার॥ ১।৩।৪॥" শ্রীমদ্‌ভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য"—ইত্যাদি ১০।৮।১৩ শ্লোক হইতে জানা যায়, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মার একদিনের অন্তর্গত কোনও এক দ্বাপরেই তাঁহার লীলা প্রকটিত করেন এবং যেই দ্বাপরে তিনি ব্রজলীলা প্রকটিত করেন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিতেই তিনি আবার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-রূপে নবদ্বীপলীলা প্রকটিত করেন। গত দ্বাপরে এই ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা প্রকটিত হইয়াছিল এবং এই কলিতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরও তাঁহার নবদ্বীপলীলা প্রকটিত করিয়াছেন।

উভয়লীলার বৈশিষ্ট্য। প্রকটলীলায় প্রদর্শিত। এই উভয় লীলার প্রকটনের হেতু বিচার করিলেই একলীলা হইতে অপর লীলার বৈশিষ্ট্য কি এবং উভয় লীলার মধ্যে সম্বন্ধই বা কি, তাহা বুঝা যাইবে। বস্তুতঃ

প্রকট-লীলাই অপ্রকট-লীলার প্রমাণ। প্রহ্লাদের প্রতি কৃপাপ্রদর্শনের জন্য শ্রীনৃসিংহদেব অবতীর্ণ হইলেন, বলি-মহারাজের প্রতি কৃপাপ্রদর্শনের জন্য শ্রীবামনদেব অবতীর্ণ হইলেন এবং রাক্ষসকুলের প্রতি কৃপাপ্রদর্শনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হইলেন। অপ্রকটে তাঁহারা না থাকিলে কোথা হইতে আসিলেন? স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গত দ্বাপরে এই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইলেন এবং এই কলিতেও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইলেন। অপ্রকট ধাম হইতেই তাঁহারাও ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়া তাঁহাদের অপ্রকট-লীলার পরিচয় দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা-প্রকটনের হেতুসম্বন্ধে শ্রীলকবিরাজ গোস্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এস্থলে প্রকাশ করা হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের দুইটী প্রধান গুণকে অবলম্বন করিয়াই কবিরাজগোস্বামী তাঁহার লীলাপ্রকটনের হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর এবং পরম-করুণ। রসিক-শেখর বলিয়া অনন্ত-রস-বৈচিত্রী আস্বাদনের জন্য তাঁহার বাসনা হওয়া স্বাভাবিক। অপ্রকট ব্রজে তিনি নিত্যকিশোর; নিত্যকিশোররূপে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের যত রকম বৈচিত্রী থাকা সম্ভব, তাহার প্রায় সমস্ত বৈচিত্রীর আস্বাদনই তিনি অপ্রকটে করিয়া থাকেন; কিন্তু বাল্যে বা পৌগণ্ডে এসমস্ত রসের যে সকল বৈচিত্রী থাকা সম্ভব, অপ্রকটে নিত্যকিশোরত্ব বশতঃ বাল্য-পৌগণ্ড নাই বলিয়া সে সমস্ত রসবৈচিত্রী আস্বাদনের সম্ভাবনা নাই। প্রকটে জন্মলীলার ব্যপদেশে তিনি নরশিশুর ন্যায় অবতীর্ণ হন, ক্রমশঃ বাল্য-পৌগণ্ড অতিক্রম করিয়া কৈশোরে আসিয়া উপনীত হন। সুতরাং বাল্য-পৌগণ্ডের দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যরসের যে সমস্ত বৈচিত্রীর আস্বাদন অপ্রকটে সম্ভব নয়, সে সমস্ত বৈচিত্রীর আস্বাদনও প্রকটে সম্ভব। এ সমস্ত রসবৈচিত্রীর আস্বাদন এবং এসমস্ত রসবৈচিত্রীর উৎসারিণী লীলায় তাঁহার পরিকর-ভক্তবর্গের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার লীলা প্রকটিত করিয়া থাকেন। প্রকট-লীলাতে আবার মধুর ভাবের পরকীয়া-ভাবাত্মিকা বৈচিত্রীও তিনি আস্বাদন করেন, যাহা অপ্রকটে সম্ভব নয় (প্রকট ব্রজলীলা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এইরূপে, তিনি রসিক-শেখর বলিয়া ভক্তের প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদনই হইল তাঁহার লীলাপ্রকটনের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রকটেও তিনি তাঁহার অপ্রকট-লীলার পরিকর সুবল-মধুমঙ্গলাদি সখাবর্গ, নন্দ-যশোদাদি পিতৃবর্গ এবং শ্রীরাধিকাদি প্রেয়সীবর্গকে সঙ্গে লইয়াই অবতীর্ণ হন (প্রকট ব্রজলীলা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। লীলা-প্রকটনের মুখ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধীয় আলোচনা ১।৪।১৫ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য)।

তারপর তাঁহার করুণা। মায়াবদ্ধ জীবের প্রতি ভগবানের করুণার পূর্ণ প্রকাশ—তাহাদের সংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে নয়, মোক্ষদান দ্বারা তাহাদের জন্ম-মৃত্যুর বিরতি সম্পাদনেও নয়, পরন্তু, ভগবানের যে মাধুর্য্য "কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা সভার মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥", তাঁহার যে "আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনি আপনা চাহে করিতে আস্বাদন॥"—সেই অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যের আস্বাদন লাভের যোগ্যতা বিধানে। এই যোগ্যতা লাভ হইতে পারে—রাগানুগা মার্গের ভজনে। এই রাগানুগা মার্গের ভজন প্রবর্ত্তন হইল শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা প্রবর্ত্তনের আনুষঙ্গিক মুখ্য কারণ। তিনি প্রকট ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার পরিকরবৃন্দের সহিত এমন সমস্ত লীলা করিলেন, সে সমস্ত লীলার কথা শুনিয়া, সে সমস্ত লীলার ব্যপদেশে ভক্তগণের আস্বাদনের জন্য প্রবাহিত আনন্দ-রস-ধারার কথা শুনিয়া, সংসার-সুখের অকিঞ্চিৎকরতা অনুভব পূর্ব্বক মায়াবদ্ধ জীব তাঁহার ভজনের জন্য প্রলুব্ধ হইতে পারে। এই পরম লোভনীয় বস্তুটী প্রকটিত করিয়া, কি ভাবে তাহা পাওয়া যাইতে পারে, "মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তঃ"—ইত্যাদি বাক্যে অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহার (রাগানুগা ভক্তির) উপদেশও তিনি দিয়া গিয়াছেন।

আর রস-নির্য্যাস আস্বাদন-বিষয়ে—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার পরিকরদের প্রেমরস-নির্য্যাস অশেষ-বিশেষে আস্বাদন করিলেন। শ্রীরাধিকাদি তদীয় কান্তাবর্গের পরিবেশিত অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিতাময় রস-বৈচিত্র্য আস্বাদন করিয়া তিনি এতই মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহাদের নিকটে তিনি অপরিশোধ্য ঋণে চিরঋণী

হইয়া রহিলেন বলিয়া নিজ মুখেই স্বীকার করিলেন—"ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজামিত্যাদি"-বাক্যে (শ্রীভা, ১০।৩২।২২)।

কিন্তু তথাপি রসিক-শেখরের রসাস্বাদন-বাসনা পরিতৃপ্তি লাভ করিল না ; পরিকরদের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের উপলক্ষ্যে আর একটী অপূর্ব্ব বস্তুর আস্বাদনের জন্য তাঁহার দুর্দ্দমনীয়া বাসনা জাগিয়া উঠিল। সেই বাসনাটী হইতেছে—তাঁহার স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের বাসনা।

শ্রীকৃষ্ণ হইলেন তাঁহার আত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্ব-চিত্তহর মাধুর্য্যের আধার বা আশ্রয় ; এই মাধুর্য্য আস্বাদন করেন তাঁহার পরিকর-ভক্তবৃন্দ। মাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র উপায়ও হইল আবার প্রেম ; যে ভক্তের মধ্যে প্রেমের বিকাশ যত বেশী, তিনি তত বেশী মাধুর্য্যই আস্বাদন করিতে পারেন। তাঁহার নিখিল পরিকরবৃন্দের মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধাতেই প্রেমের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ—মাদনাখ্য-মহাভাব—বর্ত্তমান। সুতরাং শ্রীরাধাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনে সমর্থা।

আবার শ্রীকৃষ্ণ অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যের অধিকারী হইলেও একমাত্র ভক্তের প্রেমই তাঁহার মাধুর্য্যকে উচ্ছ্সিত করিতে পারে। যাঁহার মধ্যে প্রেমের বিকাশ যত বেশী, তাঁহার সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের উচ্ছলনও তত বেশী। শ্রীরাধার প্রেম সর্ব্বাতিশায়ী বলিয়া তাঁহার সান্নিধ্যেই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের উচ্ছ্লনও সর্ব্বাতিশায়ী। শ্রীরাধার সান্নিধ্যে তাঁহার মাধুর্য্য কিভাবে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে, শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখেই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। "মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে দোঁহে কেহো নাহি হারি॥ ১।৪।১২৪॥" শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য এবং শ্রীরাধার প্রেম—উভয়েই যেন পরস্পর জোদাজেদি করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে, কেহই যেন কাহারও নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে চায়না। এইরূপ ক্রমবর্দ্ধমান মাধুর্য্যময় যে শ্রীকৃষ্ণরূপ, তাহাই মদন-মোহনরূপ, একমাত্র শ্রীরাধার সাহচর্য্যেই এই রূপের বিকাশ এবং একমাত্র শ্রীরাধাই তাঁহার অসমোর্দ্ধ-প্রেমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের এই অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন।

ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমে স্বসুখ-বাসনার ছায়া পর্য্যন্তও নাই। তাঁহাদের প্রেম হইতেছে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়। সুতরাং কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের বাসনা তাঁহাদের কৃষ্ণসেবা-বাসনার প্রবর্ত্তক নয়। তথাপি, মাধুর্য্যের আস্বাদন এবং তজ্জনিত সুখ তাঁহাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়—আগুনের কাছে গেলে তাপ অনুভবের ইচ্ছা না থাকিলেও যেমন তাপ অনুভূত হয়, তদ্রূপ। তাঁহাদের এই সুখেও কিন্তু কৃষ্ণসুখেরই পুষ্টি সাধিত হয়। কিরূপে ? তাহাই বলা হইতেছে। "গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের বাঢ়ে প্রফুল্লতা। সে মাধুর্য্য বাঢ়ে, যার নাহিক সমতা॥ 'আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এতসুখ। এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গমুখ॥' গোপী শোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাঢ়ে যত। কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোভা বাঢ়ে তত॥ এই মত পরস্পর করে হুড়াহুড়ি। পরস্পর বাঢ়ে, কেহো মুখ নাহি মুড়ি॥ কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী-রূপগুণে। তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥ অতএব সেই সুখে কৃষ্ণসুখ পোষে। ১।৪।১৬১-৬৬॥"

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাস্বাদন-জনিত সুখও শ্রীরাধারই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তাঁহার এই সর্ব্বাতিশায়ী সুখ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণেরও তদনুরূপ আনন্দ জন্মে বটে, কিন্তু এই মাধুর্য্যাস্বাদন-জনিত সুখ শ্রীরাধার বদনে-নয়নে এবং সর্ব্বাঙ্গে যে এক অনির্ব্বচনীয় উল্লাস-তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া দেয়, তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অনুভব করিতে পারেন—তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পাইতেছেন, তাহার তুলনায়—শ্রীরাধিকাদির প্রেমসেবাতে শ্রীকৃষ্ণ নিজে যে আনন্দ পাইয়া থাকেন, তাহা যেন অতি তুচ্ছ। তাই স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের লোভ জন্মে। শ্রীরাধার অঙ্গে আনন্দ-তরঙ্গ-লহরী যতই তিনি দেখেন, ততই স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের বাসনা যেন বলবতী হইতে থাকে, তিনি যেন আর লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না।

স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের বাসনার সঙ্গে সঙ্গে আরও দুইটী বাসনা স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহার চিত্তে জাগিয়া উঠে—যে প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা তাঁহার এই মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন, সেই প্রেম-বস্তুটী কিরূপ ? এই

প্রেমের মহিমা কিরূপ ? আর এই প্রেমের দ্বারা তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পান, সেই সুখই বা কিরূপ ?

এই তিনটী বাসনা ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ণই থাকে ; ব্রজে ইহার একটী বাসনাও তাঁহার পূর্ণ হওয়ার উপায় নাই। স্বমাধুর্য্য আস্বাদনের বাসনা পূর্ণ হইলেই, অপর দুইটী আনুষঙ্গিক বাসনাও আনুষঙ্গিক ভাবেই পূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু সেই মুখ্য বাসনাটীই পূর্ণ হওয়ার উপায় নাই ব্রজে। কারণ, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন করার একমাত্র উপায় প্রেমের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ মাদনাখ্য-মহাভাব। এই প্রেম ব্রজে একমাত্র শ্রীরাধার মধ্যেই বিকশিত, অন্য কাহারও মধ্যে নাই—শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়। সেই প্রেমের আমি হই কেবল বিষয়॥" তাই ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বিষয়ত্বেরই প্রাধান্য।

এই মাদনাখ্য-প্রেমের আশ্রয় হইতে না পারিলে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তাঁহার নিজের মাধুর্য্যের আস্বাদনও সম্ভব হইতে পারে না।

কিন্তু রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়-মাধুর্য্যরস-আস্বাদনের বাসনা তো অপূর্ণ থাকিতে পারে না। তাহা হইলে তাঁহার রসিক-শেখরত্বের বিকাশও অপূর্ণই থাকিয়া যায় এবং হ্লাদিনী-স্বরূপিণী শ্রীরাধার কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবাবাসনার বিকাশও অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির ধর্ম্মই হইল কৃষ্ণকে সুখ দেওয়া এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দকে সুখ দেওয়া। সেই হ্লাদিনীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ। হ্লাদিনীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীই হইলেন শ্রীরাধা। তাই—"কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব রাধিকানাম পুরাণে বাখানে॥ ১।৪।৭৫॥" স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের যে বাসনা জন্মিয়াছে, সেই বাসনা পূরণের একমাত্র উপায়—মাদনাখ্য-মহাভাব—ব্রজে শ্রীরাধার মধ্যে। শ্রীকৃষ্ণের বাসনা পূরণের জন্য এবং তাহার ব্যপদেশে সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্য শ্রীরাধা তাঁহার মাদনাখ্য-মহাভাব শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন, দিয়া স্বীয় রাধিকা-নামকে সার্থক করিলেন, শ্রীকৃষ্ণের রসিক-শেখরত্বের পূর্ণতম বিকাশের পথও উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি। "রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রপরমাণ॥ ১।৪।৮৩॥" তাই তিনি তাঁহার মাদনাখ্য-ভাব শক্তিমান্ কৃষ্ণকে দিতে পারিলেন ; কৃষ্ণও তাহা নিতে পারিলেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহার পরিকরবর্গেরও বিগ্রহ হইতেছে ভাবময় বিগ্রহ, ভাবেরই বিগ্রহ ; তাঁহাদের ভাবে এবং বিগ্রহে পার্থক্য কিছু নাই—উভয়ই শুদ্ধসত্ত্বের বিলাস। উভয়েই অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্মিলিত। তাই শ্রীরাধার ভাব দিতে হইলে তাঁহার বিগ্রহও শ্রীকৃষ্ণকে দিতে হয়। শ্রীরাধা উভয়ই দিলেন, শ্রীকৃষ্ণও নিলেন। শ্রীরাধা স্বীয় প্রতি অঙ্গদ্বারা প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া শ্যামসুন্দরকে গৌরসুন্দর করিলেন এবং স্বীয় চিত্তদ্বারা শ্যামসুন্দরের চিত্তকে আলিঙ্গন করিয়া স্বীয় প্রীতিরসে শ্যামসুন্দরের চিত্তকে সম্যক্‌রূপে পরিষিঞ্চিত পরিনিষিক্ত করিয়া তাঁহাকেও ভাবরূপা রাধা করিয়া দিলেন। এইরূপে দেখা গেল শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে আশ্রয়-স্বরূপত্বের প্রাধান্য।

এই রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর। অপ্রকট-লীলায় তিনি অনাদিকাল হইতেই এই রূপে অপ্রকট নবদ্বীপে স্বমাধুর্য্য-আস্বাদন-লীলারসে বিলসিত। প্রকট-লীলার ব্যপদেশে তাঁহার এই রূপের রহস্যটীমাত্র প্রকাশিত হইল। গত দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ব্রজলীলা অন্তর্দ্ধান করান। বর্ত্তমান কলিতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নবদ্বীপ-লীলা প্রকটিত করেন। ব্রজলীলায় স্বয়ং ভগবানের রসাস্বাদন-বাসনার যেটুকু অপূর্ণ থাকে, নবদ্বীপ-লীলায় যে তাহা পূর্ণতা লাভ করে, তাহাই জগতের জীবকে জানাইবার এবং দেখাইবার জন্য শ্রীশ্রীগৌসুন্দরের এই লীলা-প্রকটন।

প্রকট ব্রজলীলার অপূর্ণ বাসনা হইতেই গৌরলীলা প্রকটনের সূচনা হইল। ব্রজলীলার অন্তর্দ্ধানের পরে পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটী অপূর্ণ বাসনা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্থির করিলেন—"রাধিকার ভাবকান্তি

অঙ্গীকার বিনে। সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥ রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ। তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥ ১৪।২২২—২৩॥"

ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ দুইটী উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহার ব্রজলীলা প্রকট করিয়াছিলেন—রসনির্য্যাস-আস্বাদন এবং রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার। রসনির্য্যাস আস্বাদন বিষয়ে যেটুকু অপূর্ণতা ছিল, রাধাভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া তাহা পূর্ণ করার জন্য নবদ্বীপ-লীলার প্রকটন। এই হইল একটী হেতু।

নবদ্বীপ-লীলা প্রকটনের আর একটী হেতুও আছে—তাহা হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার অপর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অপূর্ণতা-পূরণ। রাগানুগা-ভক্তির প্রচারও ব্রজলীলার একটী উদ্দেশ্য ছিল। এবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ কেবল দুইটী কাজ করিলেন। প্রথমতঃ, তিনি লীলাবিলাস প্রকটিত করিলেন—যাহার কথা শুনিয়া লোকের ভজন-বিষয়ে লোভ জন্মিতে পারে। "অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥ শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৬॥" শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা সর্ব্বসাধারণে দেখিতে পায় নাই, তাঁহার লীলা শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা শুনিয়া লোকের ভজনে লোভ জন্মিতে পারে—এই সম্ভাবনা মাত্র। তিনি কৃপা করিয়া এই সম্ভবনাটীর সুযোগ দিয়া গেলেন, কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবকে লোভের বস্তুটী সাক্ষাদ্‌ভাবে দেখাইয়া যান নাই। এই অংশে ব্রজলীলায় তাঁহার রাগভক্তি-প্রচারের অপূর্ণতা রহিয়াছে।

তারপর ভজন-সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া তিনি কেবল উপদেশ মাত্র দিয়া গিয়াছেন—"মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।" কিন্তু ভজনের কোনও আদর্শ তিনি দেখাইয়া যান নাই। এদিক দিয়াও অপূর্ণতা রহিয়াছে।

নবদ্বীপ-লীলায় এই অপূর্ণতা পূরণের সঙ্কল্পও তাঁহার ছিল। তিনি স্থির করিলেন—"আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে॥ আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়। ১৩।১৮-৯॥" তিনি ভজনের আদর্শ কলির জীবকে দেখাইবেন, এই সঙ্কল্প করিলেন।

কেবল ইহাই নহে। যে বস্তুটী লাভের জন্য ভজনের উপদেশ এবং ভজনের আদর্শ প্রদর্শনের প্রয়োজন, সেই প্রেমভক্তি-বস্তুটীই কলির জীবকে দেওয়ার সঙ্কল্পও তাঁহার গৌরলীলায় ছিল। "যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥ তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে। পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানারঙ্গে॥ ১৩।২০-২১॥ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নামসঙ্কীর্ত্তন। চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥ ১৩।১৭॥"

এক্ষণে দেখা গেল, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-রূপে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের লীলাপ্রকটনের মূলে ছিল এই কয়টী বিষয়:—শ্রীরাধার ভাবে স্বীয় মাধুর্য্য এবং ব্রজলীলারসের আস্বাদন এবং তদুপলক্ষ্যে স্বীয় তিনটী অপূর্ণ বাসনার পরিপূরণ। নিজে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া ভজনের আদর্শ স্থাপন এবং তদুদ্দেশ্যে নামসঙ্কীর্ত্তনের প্রচার। আপামর-সাধারণকে ব্রজপ্রেম দান। বস্তুতঃ, যে বস্তুটী দেখিলে ভজনের জন্য জীবের লোভ জন্মিতে পারে, গৌরলীলায় সেই বস্তুটীও তিনি জগতের জীবকে দেখাইয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক, "এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়। অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনে নদীয়ায়॥ ১৩।২২॥"

শাস্ত্রপ্রমাণ। এক্ষণে কেহ বলিতে পারেন, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-সম্বন্ধে যে এত কথা বলা হইল, প্রাচীন শাস্ত্রে তাহার কোনও প্রমাণ আছে কিনা। প্রমাণ যথেষ্ট আছে, ক্রমশঃ তাহা দেখান হইতেছে।

প্রথমে পুরাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রমাণই দেখান হইতেছে।

(ক) গত দ্বাপরের প্রকট-ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ উপলক্ষ্যে গর্গাচার্য্য নন্দমহারাজের নিকটে বলিয়াছিলেন—"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লোরক্ত স্তথাপীতঃ ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ প্রাগয়ং বসুদেবস্য কচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ। বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে॥ বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে। গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ॥ শ্রীভা, ১০।৮।১৩-১৫॥" গর্গাচার্য্যের এই উক্তির তাৎপর্য্য এইরূপ। "হে নন্দমহারাজ! গুণকর্ম্মানুসারে তোমার এই পুত্রটীর অনেক রূপ এবং অনেক নামও আছে। পূর্ব্বে কোনও সময়ে ইনি বসুদেবের পুত্ররূপেও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাই অভিজ্ঞ লোকগণ ইঁহাকে বাসুদেবও বলেন।

ভিন্ন ভিন্ন যুগে ইনি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন। ইনি সত্যযুগে শুক্ল এবং ত্রেতাযুগে রক্ত হইয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে কোনও এক কলিতে ইনি পীতবর্ণও হইয়াছিলেন। এক্ষণে এই দ্বাপরে (ইঁহার সমস্ত রূপকে আকর্ষণ করিয়া নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া) ইনি কৃষ্ণ হইয়াছেন।" এস্থলে যে পীতবর্ণ-স্বরূপের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, ইনিই শ্রীগৌরাঙ্গ।

এই শ্লোকের অর্থবিচার করিলে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ; অন্য সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ তাঁহারই বিগ্রহে অবস্থিত। ইনি "একই বিগ্রহে ধরে নানাকাররূপ ॥ ২।৯।১৪১ ॥" শ্রুতির "একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি ॥"—বাক্যেও একথাই বলা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও এক কলিতে ইনিই পীতবর্ণ (গৌরবর্ণ) ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; ইঁহার এই গৌরবর্ণ-স্বরূপেও ইনি স্বয়ংভগবান্—যুগাবতারাদি অন্য কেহ নহেন। আসন্ বর্ণাঃ-শ্লোকটী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে (৬ষ্ঠ শ্লোকে) আলোচিত হইয়াছে। এই শ্লোকের গৌর-কৃপাতরঙ্গিণী টীকাতে বিস্তৃত অর্থালোচনা দ্রষ্টব্য।

(খ) পূর্ব্বোল্লিখিত "আসন্ বর্ণাঃ"-শ্লোকে যে গৌর-স্বরূপের উল্লেখ করা হইয়াছে, পরবর্ত্তী "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈ র্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ শ্রীভা, ১১।৫।৩২ ॥"-শ্লোকে তাঁহার সম্বন্ধেই একটু বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই শ্লোকে বর্ত্তমান কলির (গত যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিযুগের) উপাস্য ভগবৎ-স্বরূপের কথাই যে বলা হইয়াছে, তাহা এই শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক হইতেই জানা যায়। এই শ্লোকে বল' হইল—বর্ত্তমান কলিযুগের যিনি উপাস্য, তাঁহার অঙ্গকান্তি অকৃষ্ণ (অর্থাৎ পীত) ; কিন্তু ভিতরে তিনি কৃষ্ণবর্ণ এবং তিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিই বর্ণন করেন। এইরূপে তিনি হইলেন—অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌর। তাঁহার অঙ্গ-উপাঙ্গ এবং তাঁহার পার্ষদাদিই তাঁহার অস্ত্রস্থানীয় ; এই যুগে তিনি অন্য কোনওরূপ অস্ত্রধারণ করেন না। সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান উপকরণের দ্বারাই তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হয়।

পরম-ভাগবতোত্তম প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবের স্তুতিতে বলিয়াছিলেন, এই কলিতে যিনি অবতীর্ণ হইবেন, তিনি হইবেন প্রচ্ছন্ন—"ছন্নঃ কলৌ।"—অর্থাৎ তাঁহার নিজস্ব বর্ণটী অন্যবর্ণদ্বারা সম্যক্‌রূপে আচ্ছাদিত থাকিবে। ইহাতেই বুঝা যায়, এই কলিতে যিনি অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহার নিজস্ব বর্ণটী দেখা যাইবে না, দেখা যাইবে তাঁহার আচ্ছাদক বর্ণটী—তাঁহার কান্তি। তাই পূর্ব্বোদ্ধৃত "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোকে তাঁহার কান্তির (ত্বিষা অকৃষ্ণম্) কথাই উল্লিখিত হইয়াছে।

যাহা হউক, "ছন্নঃ কলৌ"-এই প্রহ্লাদোক্তি এবং "যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্। বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরংপদং ভূষণং ভূষণাঙ্গম্ ॥ শ্রী, ভা, ৩।২।১২ ॥"—এই উদ্ধবোক্তির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোকের অর্থালোচনা করিলে জানা যায়, হেম-গৌরাঙ্গী শ্রীরাধার সর্ব্ব অঙ্গদ্বারা সর্ব্বাঙ্গে সম্যক্ রূপে আচ্ছাদিত হইয়া স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই এই কলিতে অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌর-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে এই শ্লোকটী (১০ম শ্লোক) আলোচিত হইয়াছে। এই শ্লোকের গৌরকৃপাতরঙ্গিণী টীকায় অর্থালোচনা দ্রষ্টব্য।

(গ) শ্রীকৃষ্ণই যে অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌর হইয়া বর্ত্তমান্ কলির উপাস্যরূপে অবতীর্ণ হইবেন, তাহা শ্রীমদ্‌-ভাগবত হইতে জানা গেল। উপপুরাণের একটী শ্লোকও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে (১৫শ শ্লোক)। এই শ্লোকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন—হে ব্যাসদেব ! আমিই (স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই) কোনও এক কলিতে সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক পাপহত-লোকদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইয়া থাকি। অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্। শ্রীমদ্‌ভাগবতের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করিয়া অর্থ করিলে এই শ্লোকের "কোনও এক কলি—ক্বচিৎ কলৌ"-বাক্যে, যে দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিকেই বুঝায়।

(ঘ) উপপুরাণে কোনও এক কলিতে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যে সন্ন্যাসরূপের কথা জানা যায়, মহাভারতেও তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। মহাভারতের অনুশাসন-পর্ব্বে বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে দৃষ্ট হয়—"সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ৭৫ ॥ —যিনি সন্ন্যাসী, যিনি শম, যিনি শান্ত, যিনি নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণ।" এসমস্ত হইল ভগবানের নাম।

আবার শ্রীমদ্‌ভাগবতের "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণমের" অনুরূপ উক্তিও মহাভারতের উল্লিখিত সহস্রনাম-স্তোত্রে দৃষ্ট হয়। "সুবর্ণবর্ণঃ হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ॥ ৯২ ॥ —কৃষ্ণ এই উত্তমবর্ণদ্বয় বর্ণনকারী (শ্রীমদ্‌ভাগবতের কৃষ্ণবর্ণম্), স্বর্ণবর্ণ (শ্রীমদ্‌ভাগবতের ত্বিষাকৃষ্ণম্), উত্তমাঙ্গ, চন্দনের অঙ্গদ-ধারণকারী।" এসমস্তও ভগবানের নাম।

(ঙ) মুণ্ডকোপনিষদে পরব্রহ্মের এক রুক্মবর্ণ (স্বর্ণবর্ণ) স্বরূপের উল্লেখ পাওয়া যায়। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ৩।১।৩॥—বিদ্বান্ (ভক্তিমান্) সাধক যে সময়ে—সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বেশ্বর, ব্রহ্মেরও যোনি বা প্রতিষ্ঠা-স্থানীয় (ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্—গীতা) সেই স্বর্ণবর্ণ পুরুষকে দর্শন করেন, তখন তাঁহার সংসার-বন্ধনের হেতুভূত পাপপুণ্য সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইয়া যায়, তখন সমস্ত মায়িক উপাধি-বিবর্জ্জিত হইয়া তাঁহার স্বরূপভূত চিৎ-রূপেতে তিনি বিভু-চিৎ ব্রহ্মের পরম-সাম্য (চিদ্রূপে সাম্য, অথবা প্রেমদানবিষয়ে সাম্য) লাভ করিয়া থাকেন। এই শ্রুতিবাক্যেও গৌর-স্বরূপের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

যিনি এই কলিতে গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাতে উল্লিখিত শাস্ত্রোক্তিসমূহ যে সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

বর্ত্তমান কলির অবতার কে? শচীনন্দন। বর্ত্তমান কলিযুগের উপাস্য-অবতারের প্রসঙ্গে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীকে বলিয়াছিলেন—"কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন কলিযুগের ধর্ম্ম ॥ পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্ত্তন। প্রেমভক্তি দিলা লোকে লঞা ভক্তগণ ॥ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্র-নন্দন। প্রেমে গায় নাচে লোক করে সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২।২০।২৮৪-৮৬ ॥"

প্রভুর কথা শুনিয়া "রাজমন্ত্রী সনাতন—বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি। প্রভুর কৃপাতে পুছে অসঙ্কোচমতি ॥ অতি ক্ষুদ্র জীব মুঞি, নীচ নীচাচার। কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার ॥ প্রভু কহে—অন্যাবতার শাস্ত্রদ্বারে জানি। কলি অবতার তৈছে শাস্ত্রবাক্যে মানি ॥ সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র—পরমাণ। আমাসভা জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারা জ্ঞান ॥ অবতার নাহি কহে, 'আমি অবতার'। মুনি সব জানি করে লক্ষণবিচার ॥ ২।২০।২৯০-৯৪ ॥"

প্রভু সনাতনগোস্বামীর প্রশ্নের উত্তর সোজাভাবে দিলেন না। "অবতার নাহি কহে—আমি অবতার ॥" বলিলেন—বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের সঙ্গে মিলাইয়া অবতার নির্ণয় করেন। শাস্ত্রের বাক্যই প্রামাণ্য।

বিজ্ঞ-শব্দে বিজ্ঞানসম্পন্ন—অনুভব-সম্পন্ন ভক্তকেই বুঝায়। যাঁহার ভগবদনুভূতি জন্মিয়াছে, তিনিই বিজ্ঞ। অনুভবশীল ভক্তের নিকটে ভগবান্ আত্মগোপন করিতে পারেন না। প্রেমবলে তিনি সমস্ত জানিতে পারেন। এইরূপ প্রেমিক অনুভবশীল বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কলির অবতারকেও চিনিয়া ফেলিয়াছেন; শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গে তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ মিলাইয়া—সেই অবতারটীকে—তাঁহারা জগতের নিকটে চিনাইয়া দিয়া গিয়াছেন। শ্রীল বাসুদেব-সার্ব্বভৌম বলিয়াছেন—"কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥" শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন—"অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ। রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্ স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥" শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন—"স্বদয়িতনিজভাবং যো বিভাব্য স্বভাবাৎ সুমধুরমবতীর্ণো ভক্তরূপেণ লোভাৎ। জয়তি কণকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনুরেষঃ ॥ বৃ, ভা, ১।১।৩॥" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন—"অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্। কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥ তত্ত্বসন্দর্ভঃ। ২॥" শ্রীল স্বরূপদামোদর বলিয়া গিয়াছেন—"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়-বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং

রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥” আর নিজের অনুভবের সহিত ইঁহাদেরই অনুভব মিলাইয়া রসিক-ভকত-কুলমুকুটমণি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন—“পিতামাতা গুরুগণ আগে অবতারি। রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার করি॥ নবদ্বীপে শচীগর্ভ শুদ্ধ-দুগ্ধসিন্ধু। তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু॥ ১।৪।২৬-২৭॥”

এস্থলে কেবল দু'চার জনের কথাই বলা হইল। কাহারও আদেশ, উপদেশ, প্ররোচনা বা পীড়াপীড়ি ব্যতীতই—এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কে, তাহার সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার দর্শন-মাত্রেই তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া অনুভব করিয়াছেন—অগ্নির প্রভাব না জানা সত্ত্বেও তাহার নিকটে গেলে যেমন উত্তাপ অনুভূত হয়, তদ্রূপ।

১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে যিনি শচীর দুলালরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, চব্বিশ বৎসর গৃহস্থাশ্রম-লীলা প্রকাশের পরে যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম প্রকাশ পূর্ব্বক সন্ন্যাসলীলা প্রকটিত করিয়াছেন, সন্ন্যাসের পরে নীলাচলে যাইয়া নীলাচল হইতে দাক্ষিণাত্য, ঝারিখণ্ড, বারাণসী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণের ছলে যিনি অসংখ্য জীবকে নাম-প্রেম বিতরণ করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন এবং এইভাবে ছয় বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া প্রকটলীলার শেষ আঠার বৎসর শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া নীলাচলে গম্ভীরায় যিনি শ্রীকৃষ্ণ-বিরহার্ত্তিতে আকুল হইয়া কালাতিপাত করিয়াছিলেন—সেই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরই শ্রীমদ্ভাগবতের “কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্” ইত্যাদি শ্লোকোক্ত কলির উপাস্যস্বরূপ।

শচীনন্দনই যে কলির অবতার, তাহার প্রমাণ? যিনি ১৪০৭ শকে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনিই যে পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্র-কথিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ, তাহার প্রমাণ কি? অসাধারণ ভক্তি-সম্পদ্-বিশিষ্ট কোনও পরম-ভাগ্যবান্ ভক্ত জীবও তো ইনি হইতে পারেন? ইনি যে জীব নহেন, পরন্তু স্বয়ং ভগবান্, ক্রমশঃ তাহা দেখান হইতেছে।

(ক) মানুষের দেহ নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত লম্বা। আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মার দেহও সাড়ে তিন হাত (শ্রীভা, ১০।১৪।১১)। কিন্তু স্বয়ংভগবানের বিগ্রহ হয় “ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল”—নিজ হাতের চারিহাত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দেহও তাঁহার নিজ হাতের চারিহাত লম্বা ছিল। “দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাতে। চারিহস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে॥ ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল হয় তার নাম। ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল চৈতন্য গুণধাম॥ ১।৩।৩৩-৩৪॥”

(খ) সর্ব্বপ্রথমে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তৎকালীন পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীপাদ বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভুর দেহে যে সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বিকার দেখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিস্ময়ের হেতু এই যে, এই সমস্ত সাত্ত্বিক বিকার তিনি পূর্ব্বে তো কখনও দেখেনই নাই, তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, কেবলমাত্র নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণপরিকরের (শ্রীরাধার) মধ্যেই এজাতীয় সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক সম্ভব, মানুষের কথা তো দূরে, অপর কোনও ভগবৎ-পরিকরের মধ্যেও সম্ভব নয়। “এই কৃষ্ণ-মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার॥ সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক এই—নাম যে প্রলয়। নিত্যসিদ্ধ ভক্তে সে সুদ্দীপ্ত ভাব হয়॥ অধিরূঢ় ভাব যার তার এ বিকার। মনুষ্যের দেহে দেখি, বড় চমৎকার॥ ২।৬।১০—১২॥” অদ্বৈতবাদী সার্ব্বভৌমের প্রতি তখনও প্রভুর পূর্ণ কৃপা হয় নাই; তাই তিনি তখনও প্রভুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, প্রভুর দেহে যে শ্রীরাধার ভাব-সুলভ সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বিকার প্রকটিত হইয়াছিল, সার্ব্বভৌম তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

(গ) যান-বাহনযোগে বা পদব্রজে না আসিয়া হঠাৎ কোনও স্থানে যে ভগবান্ লোক-লোচনের গোচরী-ভূত হন, ইহাকে আবির্ভাব বলে; যেমন নৃসিংহদেব প্রহ্লাদের সাক্ষাতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিভুবস্তু ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষে এইরূপ আবির্ভাব সম্ভব নয়। ইহা কায়ব্যূহ নহে; যোগসিদ্ধ মানুষ কায়ব্যূহ

প্রকাশ করিতে পারেন ; যেমন শভরী ঋষি করিয়াছিলেন। কায়ব্যূহে একই জীবাত্মা বিভিন্ন কায়ব্যূহে প্রভাব বিস্তার করে ; তাই সকল কায়ব্যূহেরই ক্রিয়া একই রকম হয়। কিন্তু আবির্ভাব এরকম নয়। প্রত্যেক আবির্ভাব-রূপেরই স্বতন্ত্র ব্যবহার। বিভুবস্তু ভগবান্ সর্ব্বত্রই অবস্থান করেন ; কৃপা করিয়া যখন যেখানে কাহাকেও দর্শন দিতে ইচ্ছা করেন, তখন সেখানেই তাঁহাকে দর্শন দিতে পারেন। এইভাবে দর্শন দেওয়াকে আবির্ভাব বলে। রাঘবের গৃহে, শচীদেবীর গৃহে, শ্রীবাসের অঙ্গনে, সেন-শিবানন্দের গৃহে এবং আরও বহুস্থানে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু আবির্ভাবে দর্শন দিয়াছিলেন ; অথচ তখন তিনি নীলাচলে অবস্থিত। তিনি যে বিভু—সর্ব্ব-ব্যাপক—ছিলেন, ইহাই তাহার প্রমাণ।

এসমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল, প্রভু জীবতত্ত্ব ছিলেন না ; তিনি ছিলেন বিভুতত্ত্ব। আর সার্ব্বভৌমের অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায়, তিনি রাধাভাবাবিষ্ট ছিলেন।

(ঘ) সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে কীর্ত্তন-সময়ে প্রভু অঙ্গদ-বালার আকারে চন্দন-পঙ্ক ধারণ করিতেন। তাঁহার বর্ণও ছিল তপ্ত-স্বর্ণের ন্যায়। মহাভারতোক্ত বিষ্ণু-সহস্রনাম-স্তোত্রে শ্রীবিষ্ণুর যে সমস্ত লক্ষণের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুতেও সেই সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান ছিল।

(ঙ) শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া এই কলিতে পাপহত লোকদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত উপপুরাণোক্ত লক্ষণসমূহ দৃষ্ট হইতেছে।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দুইটী বিশেষ লক্ষণ—যাহা অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপে দৃষ্ট হয়না, তাহা—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুতে দৃষ্ট হয়। নিম্নে তাহা দেখান হইতেছে।

(চ) স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র "একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ।" শ্রুতির "একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি।" স্বয়ংভগবান্ যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহার বিগ্রহের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই স্ব-স্ব-পূর্ণতম মহিমায় বিরাজিত থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত একথাই বলিয়াছেন। "পূর্ণভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার-তাতে আসি মিলে॥ নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার। যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥ সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ। ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥ ১।৪।৯-১১॥" লঘু-ভাগবতামৃতে ইহার শাস্ত্রপ্রমাণ দৃষ্ট হয়। লীলায় এই শাস্ত্রোক্তির প্রমাণ শ্রীকৃষ্ণ দেখাইয়া গিয়াছেন। গোবর্দ্ধনের সাম্নুদেশে ব্রহ্মাকে তিনি অনন্ত নারায়ণরূপ দেখাইয়াছিলেন এবং কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গণে স্বীয় বিগ্রহেই অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন।

সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার নিমাই-পণ্ডিত-বিগ্রহে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের প্রকাশ দেখাইয়া উল্লিখিত তত্ত্বটী প্রত্যক্ষভাবে লোকনয়নের গোচরীভূত করাইয়াছিলেন। নবদ্বীপ-লীলায় তাঁহার শচীনন্দন-দেহেই রাম-সীতা-লক্ষ্মণ (চৈ, ভা, মধ্যে ১০) ; মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ-নৃসিংহ-বামন-বুদ্ধ-কল্কি এবং শ্রীকৃষ্ণ (চৈ, ভা, মধ্য ২৫ এবং ৮), নারায়ণ (চৈ, ভা, মধ্য ২), বরাহ (চৈ, ভা, মধ্য ৩), বিশ্বরূপ (চৈ, ভা, মধ্য ৬) শিব (চৈ, ভা, মধ্য ৮), বলরাম (চৈ, চ, ১।১৭।১০৯-১৩), লক্ষ্মী-রুক্মিণী-ভগবতী (চৈ, ভা, মধ্য ১৮) প্রভৃতি ভগবৎ-স্বরূপের রূপ দেখাইয়াছিলেন। সন্ন্যাসের পরে বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে এবং সন্ন্যাসের পূর্ব্বেও শ্রীনিতানন্দাদিকে যড়ভুজরূপে দর্শন দিয়াছিলেন। এসমস্ত রূপ দেখার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছিল, দর্শন-সময়ে তাঁহারা শচীনন্দনের দেহ আর দেখেন নাই, তৎ-স্থলে তত্তৎ-ভগবৎ-স্বরূপের রূপই দেখিয়াছিলেন। রায়রামানন্দও প্রভুর সন্ন্যাসরূপের স্থলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন। ইহা স্বয়ংভগবানের একটী বিশেষ লক্ষণ। বস্তুর পরিচয় হয় বিশেষ লক্ষণে।

(ছ) স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আর একটী বিশেষ লক্ষণ হইতেছে প্রেমদাতৃত্ব। ভগবানের অনন্ত স্বরূপ আছেন সত্য, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই প্রেম দান করিতে পারেন না ; শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু কেবল মানুষকে নয়, লতাগুল্মাদিকে পর্য্যন্ত ভগবৎ-প্রেম দান করিতে সমর্থ। "সন্ত্যবতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥ ল, ভা,॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু জগাই-মাধাই হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষ লক্ষ লোককে ব্রজপ্রেম দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। ঝারিখণ্ডপথে শ্রীবৃন্দাবন যাওয়ার সময়ে ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুকে পর্য্যন্ত তিনি প্রেম দিয়াছেন। তাঁহার দর্শনেই তাহারা কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ"-শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক নৃত্য করিয়াছে, তাহাদের দেহে অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারের উদয় হইয়াছে, ব্যাঘ্র-মৃগ এক সঙ্গে গলাগলি হইয়া নৃত্য করিয়াছে। কত কোল-ভীল সাঁওতাল, কত বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছ তাঁহার কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম পাইয়া ধন্য হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। নীলাচলেই শিবানন্দ-সেনের কুক্কুর প্রভুপ্রদত্ত নারিকেল শাস খাইয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" শব্দ উচ্চারণ করিয়াছে।

প্রেমদান-বিষয়ে সন্ন্যাসের পরে প্রভু আরও এক অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। প্রভু পথে চলিয়া যাইতেছেন, মুখে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ"-নাম ; অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়নে গলদশ্রু-ধারা ; অঙ্গে পুলক-কদম্ব, বাহ্যজ্ঞান-শূন্য, যেন অভ্যাসবশে স্খলিত চরণে চলিয়া যাইতেছেন—প্রেমঘন-বিগ্রহ, সর্ব্বদিকে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। যে পথিক তাঁহার দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, প্রেমের বন্যা তাঁহাকেও যেন স্পর্শ করিয়াছে, কেবল স্পর্শ নয়—তাঁহার দেহের মনের সমগ্র ইন্দ্রিয়-নিচয়ের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকেও প্রভুর নিজেরই ন্যায় প্রেমোন্মত্ত করিয়া দিয়াছে, তিনিও তখন কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া লোকাপেক্ষা ত্যাগ করিয়া কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখনও নৃত্য করেন, কখনও চীৎকার করেন—ঠিক যেন উন্মত্ত। কেবল ইহাই নয়, কেবল দর্শনের প্রভাবেই প্রভু তাঁহার মধ্যে এমনই এক অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চার করিলেন যে, অপর যে কেহ তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন, তাঁহার অবস্থাও ঠিক তদ্রূপই হইয়াছে। এইরূপে দেখা গিয়াছে—যিনি এই ভাবে এই রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শন পাইয়াছেন, তাঁহার কৃপায় তিনিও প্রেমদান-বিষয়ে যেন প্রভুর পরম-সাম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। মুণ্ডক-শ্রুতি বোধ হয় প্রভুর এই অদ্ভুত প্রেমদানের কথাই বলিয়াছেন। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ৩।১।৩ ॥"

এস্থলে যে সমস্ত লক্ষণের কথা বলা হইল, এসমস্ত লক্ষণ স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন ব্যতীত অপর কাহারও মধ্যেই থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রভু যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশই থাকিতে পারেনা।

রসরাজ-মহাভাব। বস্তুতঃ, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ, রায়-রামানন্দকে প্রভু কৃপা করিয়া তাহা দেখাইয়াছেন এবং বলিয়াছেনও। ব্যাপারটী এই।

রায়রামানন্দের মুখে প্রভু যে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ করাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার পরে একদিন প্রভুর সাক্ষাতে রামানন্দ এক অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করিলেন এবং প্রভুকে তাহার হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। "এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে। কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে ॥ পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসি-স্বরূপ। এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম গোপরূপ ॥ তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন-পঞ্চালিকা। তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা ॥ তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন। নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন ॥ এই মত তোমা দেখি হয় চমৎকার। অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার ॥ ২।৮।২২০-২৪ ॥"

প্রভুর সন্ন্যাসি-রূপের স্থলেই রামানন্দরায় দেখিলেন—শ্যামসুন্দর বংশীবদন নানাভাবে-চঞ্চল কমল-নয়ন শ্রীকৃষ্ণকে, আর তাঁহার সম্মুখে দেখিলেন কাঞ্চন-পুত্তলিকাতুল্যা শ্রীরাধাকে, শ্রীরাধার নবগোরচনাগৌর অঙ্গ হইতে গৌরবর্ণ কিরণচ্ছটা সর্ব্বদিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে, সেই গৌর-কিরণচ্ছটাতে বংশীবদনের শ্যাম অঙ্গ ঢাকা পড়িয়া যেন গৌর হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া রামানন্দ বিস্মিত হইলেন, প্রভুকে এই অপূর্ব্ব রহস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

"ছন্নঃ কলৌ"—প্রভু কিন্তু সব সময়েই আত্মগোপন করিতে চাহেন ; প্রেমিক ভক্তের নিকটে ধরা পড়িয়াও যেন সহজে তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। রঙ্গিয়া প্রভুর ইহাও এক রঙ্গ। প্রভু রামরায়কে বলিলেন—না রামানন্দ ! তুমি যাহা দেখিতেছ, তোমার গাঢ়প্রেমের স্বভাবেই তোমাকে তাহা দেখাইতেছে। রাধাকৃষ্ণে তোমার প্রগাঢ় প্রীতি ; তাই তুমি যে দিকেই দৃষ্টিপাত করনা কেন, রাধাকৃষ্ণই দেখ। আমি কিন্তু যে-ই সন্ন্যাসী, এখনও সেই সন্ন্যাসীই। "প্রভু কহে, কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়। প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় ॥ মহাভাগবত

দেখে স্থাবর-জঙ্গম। তাহাঁ তাহাঁ হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূরণ॥ স্থাবর-জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥ রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়। যাহাঁ তাহাঁ রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফূরয়॥ ২।৮।২২৫-২৮॥"

মহাভাগবতোত্তম প্রেমিক ভক্ত রায়-রামানন্দের নিকটে প্রভুর আত্মগোপন-চেষ্টা ব্যর্থ হইল। প্রেমবলে রামানন্দ প্রভুর তত্ত্ব জানিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলিলেন—"তুমি প্রভু, ছাড় ভারি ভুরি। মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি॥ রাধিকার ভাব-কান্তি করি অঙ্গীকার। নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥ নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম-আস্বাদন। আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥ আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার। এবে কপট কর তোমার কোন ব্যবহার॥ ২।৮।২২৯-৩২॥"

কি উদ্দেশ্যে প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন, রামানন্দ তাহা ঠিকমতই জানিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তিনি বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন, শ্রীরাধার গৌরকান্তিতে আচ্ছাদিত যে শ্যামরূপ তিনি দেখিয়াছেন, তাহাই বুঝি প্রভুর স্বরূপ। তাই তিনি বলিলেন "রাধিকার ভাব-কান্তি করি অঙ্গীকার।" প্রভুর প্রকৃত স্বরূপের দর্শন রামানন্দ তখনও পান নাই, তদনুরূপ কৃপাও বোধ হয় প্রভু তখন পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নাই। যাঁহারা মনে করেন, শ্রীরাধার ভাব এবং কান্তিমাত্র গ্রহণ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইয়াছেন, তাঁহাদের ভ্রান্তিটুকু দেখাইবার জন্যই বোধ হয় প্রভু ভঙ্গী করিয়া রামানন্দের সাক্ষাতে—শ্যামসুন্দর এবং শ্রীরাধিকারূপে প্রথমে আত্মপ্রকট করিলেন।

যাহা হউক, রামরায়ের উক্তি শুনিয়া প্রভু একটু হাসিলেন। হাসির তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে—"রামানন্দ, তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাই আমার স্বরূপ নয়। আচ্ছা, আমার স্বরূপ কি, তাহা দেখ।" তখন—"তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইল স্বরূপ। রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥ ২।৮।২৩৩॥" কৃপা করিয়া রামানন্দরায়কে প্রভু যে রূপটী দেখাইলেন, তাহাই প্রভুর স্বরূপ। তাহা এক অপূর্ব্ব বস্তু; রামানন্দ পূর্ব্বে কখনও তাহা দেখেন নাই, বুঝিবা ধ্যানেও কখনও এই রূপ তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তে উদ্‌ভাসিত হয় নাই। যাহা দেখিলেন, তাহা সন্ন্যাসি-রূপ নহে, সাক্ষাতে কিঞ্চিদ্দূরে অবস্থিতা নবগোরচনা-গৌরী শ্রীরাধার গৌরকান্তিতে আচ্ছাদিত শ্যামসুন্দর রূপও নহে। ইহা তদপেক্ষাও এক অতি অপূর্ব্ব, অতি আশ্চর্য্য রূপ। ইহা—রসরাজ ও মহাভাব—এই দু'য়ের অপূর্ব্ব মিলনে—শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাবময়ী শ্রীরাধা, এই দু'য়ের মিলনে—এক অতি অনির্ব্বচনীয় রূপ। এই রূপে, শ্রীকৃষ্ণের নবজলধর-শ্যাম রূপ শ্রীরাধার অঙ্গের কেবল কান্তিদ্বারামাত্র প্রচ্ছন্ন নহে—শ্রীরাধার গৌর-অঙ্গদ্বারাই আচ্ছাদিত—নবগোরচনা-গৌরী বৃষভানু-নন্দিনীর প্রতি অঙ্গই যেন প্রেমভরে গলিয়া, নন্দ-নন্দনের প্রতি শ্যাম অঙ্গে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। অথচ মহাভাবময়ীর দেহরূপ গৌর-আবরণের ভিতর দিয়া রসরাজের শ্যাম-তনুও যেন লক্ষিত হইতেছে। স্নিগ্ধকান্তি নবজলধর যেন শারদ-জ্যোৎস্নায়-ছানা সৌদামিনী দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, অথচ ঐ সৌদামিনীর ভিতর দিয়া যেন নব-জলধরের স্নিগ্ধ শ্যাম-কান্তির ছটাও অনুভূত হইতেছে—রসরাজ এবং মহাভাবের অস্তিত্ব ও মিলন, একের দ্বারা অপরের আচ্ছাদন—যেন যুগপৎই উপলব্ধি হইতেছে। এই অপূর্ব্ব এবং অনির্ব্বচনীয় রূপটী যেন শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহন-রূপেরই—যুগলিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ পরম-স্বরূপেরই চরম-পরিণতি। মহাভাবের দ্বারা নিবিড়তমরূপে সমালিঙ্গিত শৃঙ্গার-রসরাজের এই অনির্ব্বচনীয় রূপটী একমাত্র অনুভবেরই বিষয়।

যাহা হউক, এই অপূর্ব্ব-রূপটী "দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিত। ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিত॥ ২।৮।২৩৪॥" তখন-"প্রভু তারে হস্ত স্পর্শে করাইল চেতন। সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন॥ ২।৮।২৩৫॥"—যখন রায়ের আনন্দ-মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল, দেখিলেন—যেই সন্ন্যাসী, সেই সন্ন্যাসী।

তখন রামানন্দকে "আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন। তোমা বিনা এইরূপ না দেখে কোন জন॥ মোর তত্ত্ব-লীলা-রস তোমার গোচরে। অতএব এই রূপ দেখাইল তোমারে॥ ২।৮।২৩৬-৩৭॥" এই অপূর্ব্ব রূপের রহস্যটীও তিনি রামানন্দের নিকটে প্রকাশ করিলেন। "গৌর অঙ্গ নহে মোর, রাধাঙ্গ-স্পর্শন। গোপেন্দ্র-সুত বিনা তেহোঁ না স্পর্শে অন্য জন॥ তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন। তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন॥ ২।৮।২৩৮-৩৯॥—রামানন্দ! আমার নিজের অঙ্গ বাস্তবিক গৌর নহে; আমার প্রতি অঙ্গে

গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা তাঁহার প্রতি গৌর অঙ্গ দ্বারা স্পর্শ করিয়া আছেন বলিয়াই আমাকে গৌর দেখায়। তিনিও ব্রজেন্দ্র-নন্দন ব্যতীত অপর কাহাকেও কখনও স্পর্শ করেন না। শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাব দ্বারা আমার নিজের দেহ-মনকে বিভাবিত করিয়াই আমি নিজের মাধুর্য্য-রস আস্বাদন করিতেছি।” ভঙ্গীতে প্রভু জানাইলেন—তিনি ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ; শ্রীরাধার গৌর-অঙ্গ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে আচ্ছাদিত হইয়া শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত হইয়া স্বমাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন।

যাহা হউক, যে উদ্দেশ্যে প্রভু তাঁহার নবদ্বীপ-লীলা প্রকটিত করিলেন, কি ভাবে তিনি সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিলেন, এক্ষণে তাহারই দিগ্‌দর্শন দেওয়া হইতেছে।

রসাস্বাদন। প্রথমে তাঁহার রসাস্বাদনের কথারই ইঙ্গিত দেওয়া হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়া নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া ব্রজলীলারস এবং সেই লীলার ব্যপদেশে উৎসারিত স্বীয় মাধুর্য্যরসও আস্বাদন করিয়াছেন। যে লীলারস ব্রজে তিনি বিষয়রূপে আস্বাদন করিয়াছেন, তাহাই নবদ্বীপে আশ্রয়রূপে আস্বাদন করিলেন।

ব্রজলীলায় শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীদিগের কৃষ্ণপ্রীতি প্রকাশের এবং আস্বাদনের দ্বার ছিল—নৃত্য, গীত, আলিঙ্গন, চুম্বনাদি। আর নবদ্বীপে সেই প্রীতি-প্রকাশের এবং আস্বাদনের দ্বার হইরাছে—সঙ্কীর্ত্তন, সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন, ব্রজস্মৃতির উদ্দীপক বিষয়াদি। ব্রজের রাসলীলাতে যে রসের উৎস প্রসারিত হইয়াছিল, নবদ্বীপে শ্রীবাস-অঙ্গনের কীর্ত্তনেও তাহারই বিকাশ। এই রসতরঙ্গের কোমল অথচ প্রবল স্পর্শেই শ্রীবাসের হৃদয় হইতে বৃন্দাবন-মাধুর্য্য, গোপীকুল-চিত্তোন্মাদকারী বংশীবাদন, রাসোৎসব, ছয়ঋতু-বনবিহার, জলকেলি-আদি লীলারস-মন্দাকিনী উৎসারিত হইয়া রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর চিত্তকে পরিষিঞ্চিত করিয়াছিল।

দর্শনের দ্বার দিয়া ব্রজরস আস্বাদনের বিশেষ বিকাশ দৃষ্ট হয় নীলাচলে। সন্ন্যাসের রুক্ষ আবরণে স্বীয় প্রেমরস-ঘন বিগ্রহকে লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা সত্ত্বেও নীলাচলে প্রভুর সেই প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। প্রেমরসের অজস্র-ধারায় তাঁহার রুক্ষ যতি-বেশকেও পরিনিষিক্ত হইয়া রুক্ষতা ত্যাগ করিতে হইয়াছে। প্রভু চব্বিশ বৎসর নীলাচলে ছিলেন; তন্মধ্যে প্রথম ছয় বৎসরের মধ্যে মাঝে মাঝে নীলাচলের বাহিরেও তিনি কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন; এই বহিরবস্থিতির কাল চারিবৎসরের বেশী হইবে না। বাকী বিশ বৎসর নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রভু প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রীজগন্নাথের সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখ-মাধুর্য্য পান করিয়াছেন, তাঁহার দর্শনের প্রভাবে যে সকল ব্রজলীলা প্রভুর চিত্তে স্ফুরিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত লীলারসও আস্বাদন করিয়াছেন। প্রভু সাধারণতঃ শ্রীজগন্নাথকে জগন্নাথরূপে দেখিতেন না; তিনি দেখিতেন—শ্রীমন্দিরের রত্নসিংহাসনে ব্রজবিহারী শ্যামসুন্দর বংশীবদনই দাঁড়াইয়া আছেন, আর দেখিতেন “নানাভাবে চঞ্চল তাঁর কমল-নয়ন।” শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু এই রূপের মাধুর্য্যই পান করিতেন—তৃষিত চাতকের মত।

প্রভু প্রায় প্রতিদিনই জগন্নাথের শয্যোত্থান দর্শন করিতেন। তখন প্রভু বোধ হয় ব্রজের কুঞ্জভঙ্গ-লীলার রসেই নিমগ্ন থাকিতেন। তিনি দেখিতেন—রত্নমন্দিরে জগন্নাথকে নয়—ব্রজের নিভৃত নিকুঞ্জে প্রীতিপরায়ণা সখীবৃন্দের সযত্ন-সজ্জিত নিবৃন্ত-কুসুমাস্তীর্ণ সুকোমল শয্যায় শয়ান নিদ্রালস-নিমীলিত-নয়ন রসিক-শেখর নাগর-রাজকে। ভাবাবেশে প্রভুর আত্মস্মৃতি নাই। শ্রীরাধারই ন্যায় তখন তিনিই যেন “উঠহে নাগর-বর, আলিস পরিহর, ঘুমেতে না হও অচেতন”—বলিয়া “পদ চাপি বঁধুরে” জাগাইতেন। আসন্ন বিরহের ভাবে কত আর্ত্তি কত দৈন্য প্রকাশ করিতেন। অশ্রুধারায় বসন ভিজিয়া ভূমিতলে স্রোত বহিয়া যাইত। “গরুড়ের সন্নিধানে, রহি করে দরশনে, সে আনন্দের কি কহিব বলে। গরুড়-স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্ন খালে, সে খাল ভরিল অশ্রুজলে॥ ২।২।৪৭॥”

আর যখন শ্রীমন্দিরে প্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের স্বরূপ দর্শন পাইতেন, অথবা রথযাত্রা-সময়ে রথের উপরে তাঁহার দর্শন পাইতেন, তখন রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু মনে করিতেন, তিনি যেন কুরুক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছেন।

"যে কালে দেখে জগন্নাথ, শ্রীরাম-সুভদ্রা সাথ, তবে জানে—আইলাঙ কুরুক্ষেত্র। সফল হৈল জীবন, দেখিলুঁ পদ্মলোচন, জুড়াইল তনু-মন-নেত্র॥ ২।২।৪৬॥" তখন কত আর্ত্তিভরে প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেন—"সেই তুমি সেই আমি সে নব সঙ্গম॥ তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে উদয় করাহ আপন-চরণ॥ ইহাঁ লোকারণ্য, হাথি ঘোড়া রথধ্বনি। তাহাঁ পুষ্পারণ্য, ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি॥ ইহা রাজবেশ সব সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ। তাহাঁ গোপগণ সঙ্গে মুরলীবদন॥ ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন। সে-সুখ-সমুদ্রের ইহাঁ নাহি এককণ॥ আমা লৈয়া পুন লীলা কর বৃন্দাবনে। তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত পূরণে॥ ২।১৩।১২০—২৫॥ অন্যের 'হৃদয়' মন, আমার মন 'বৃন্দাবন', মনে বনে এক করি জানি। তাহাঁ তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়, তবে তোমার পূর্ণকৃপা মানি॥ ২।১৩।১৩০॥"

নদী দেখিলে প্রভুর মনে হয়—এই-ই যমুনা; সরোবর দেখিলে মনে হয়—এই-ই শ্যামকুণ্ড—রাধাকুণ্ড; বন দেখিলে মনে হয়—এই-ই শ্রীবৃন্দাবন; পর্ব্বত দেখিলে মনে হয়—এই-ই গোবর্দ্ধন। কেবল মনে হওয়া নয়; শ্রীরাধা এই সকল স্থলে যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তবিনোদন করিতেন, প্রভুও সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া—নদীতে বা সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন, যেন প্রিয়সখীদের সঙ্গে লইয়া প্রাণ-বঁধুয়ার সহিত জলকেলি করার জন্য। পর্ব্বতের দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া যাইতেন—গোবর্দ্ধন-গিরি-কন্দরে মদন-মোহনের সহিত মিলিত হওয়ার জন্য; কণ্টকের আঘাতে দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইত, রুধির-ধারায় গৌর অঙ্গ রঞ্জিত হইয়া যাইত—প্রভু অনুসন্ধান-শূন্য।

জ্যোৎস্নাবতী রজনী। প্রভু সমুদ্রের দিকে যাইতেছেন। পথে এক পুষ্পোদ্যান; বৃন্দাবন মনে করিয়া প্রভু তাহাতে প্রবেশ করিয়া প্রেমাবেশে কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন—রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে যেরূপ আর্ত্তি ও উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ প্রতি তরুলতার নিকটে কৃষ্ণের সন্ধান করিয়াছিলেন, ঠিক সেইভাবে। একে একে নানা বৃক্ষকে সম্বোধন করিয়া প্রভু বলিয়াছেন—"আম্র পনস পিয়াল জম্বু কোবিদার। তীর্থবাসী সভে—কর পর উপকার॥ কৃষ্ণ—তোমার ইহাঁ আইলা—পাইলা দর্শন। কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন॥" উত্তর পান না। ভাবেন—"এসব পুরুষ জাতি—কৃষ্ণের সখার সমান। এ কেনে কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায়॥" তখন তুলসী-আদি স্ত্রী-জাতীয় লতাকে জিজ্ঞাসা করেন—"তুলসী মালতি যূথি মাধবি মল্লিকে! তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অন্তিকে? তুমি সব হও আমার সখীর সমান। কৃষ্ণোদ্দেশ কহি সভে রাখহ পরাণ॥" উত্তর পান না; ভাবেন—"এ তো কৃষ্ণদাসী, ভয়ে না কহে আমারে॥" তারপর মৃগীদিগকে, পুষ্প-ফলভারাবনত বৃক্ষাদিকেও ঐরূপ আর্ত্তির সহিত কৃষ্ণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

রাধাপ্রেমের কি অদ্ভুত রীতি! বৃক্ষ, লতা, মৃগী—এসব যে কোনও কথার জবাব দিতে পারিবে না, সেই খেয়াল প্রভুর নাই। থাকিবেই বা কিরূপে? তাঁহার সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ—সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তি—কৃষ্ণেতে কেন্দ্রীভূত; অন্যবিষয়ে অনুসন্ধানের অবকাশ কোথায়? যাহা হউক, বুকফাটা আর্ত্তির সহিত বিলাপ করিতে করিতে প্রভু কৃষ্ণকে অনুসন্ধান করিয়া বনে ফিরিতেছেন। অজ্ঞাতসারেই সমুদ্রের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; প্রভু মনে করিলেন—এই-ই যমুনা; তখন—"দেখে—তাহাঁ কৃষ্ণ হয় কদম্বের মূলে॥ কোটিমন্মথ-মোহন মুরলীবদন। অপার সৌন্দর্য্য হরে জগন্নেত্র-মন॥ সৌন্দর্য্য দেখিতে ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা হঞা।" সঙ্গিগণ অতিযত্নে মূর্চ্ছাভঙ্গ করাইলেন। অর্দ্ধবাহ্য দশা। সেই দশাতেই প্রলাপোক্তিতে সমস্ত প্রকাশ।

প্রভুর নীলাচল-লীলার শেষ বার বৎসর প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই কৃষ্ণ-বিরহ-স্ফূর্ত্তিতেই অতিবাহিত হইয়াছে। "শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব-দর্শনে। এই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রি-দিনে॥ নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ। ভ্রমময় চেষ্টা সদা—প্রলাপময় বাদ॥ রোমকূপে রক্তোদগম, দন্ত সব হালে। ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥ গম্ভীরা-ভিতরে রাত্র্যে নাহি নিদ্রা লব। ভিত্ত্যে মুখ-শির ঘষে, ক্ষত হয় সব॥ ২।২।৩-৬॥" রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ-জনিত আর্ত্তি তাঁহার অসংখ্য প্রলাপোক্তিতে উদ্গীরিত হইয়াছে। বস্তুতঃ কৃষ্ণ-বিরহও একটী রস; ইহাও আস্বাদ্য। বিরহে "বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়, কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত। এই প্রেমার আস্বাদন,

তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণ, মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন॥ সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে, বিষামৃতে একত্র মিলন॥ ২।২।৪৪-৪৫॥"

কখনও বা "চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি, কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ। স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে, গায় শুনে পরম আনন্দ॥ ২।২।৬৬॥"

এইরূপে নানাভাবে প্রভু ব্রজের লীলারস-মাধুর্য্য এবং শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া ব্রজের রসাস্বাদন-বাসনার অপূর্ণতা নবদ্বীপ-লীলায় পূর্ণ করিলেন।

রাধা-প্রেম-মহিমা। রাধাপ্রেমের মহিমা জানিবার জন্যও ব্রজে নন্দ-নন্দনের দুর্দ্দমনীয় লালসা জন্মিয়াছিল। নবদ্বীপ-লীলায় তাঁহার সেই বাসনা তৃপ্তি লাভ করিয়াছে।

ব্রজে শ্রীরাধা একসময়ে আক্ষেপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন—"মরিয়া হইব নন্দের নন্দন তোমারে করিব রাধা।" শ্রীরাধার মরা অবশ্য হয় নাই, নন্দ-নন্দন হওয়াও হয় নাই; কিন্তু তাঁর অসাধারণ প্রেম যে নন্দ-নন্দনকে 'রাধা' করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কি অদ্ভুত প্রভাব রাধাপ্রেমের! সর্ব্বজ্ঞ স্বয়ংভগবানের পর্য্যন্ত আত্মবিস্মৃতি জন্মাইয়া দিল! আর সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব ভাবকে কোন্ গভীরতম-প্রদেশে চাপিয়া রাখিয়া নিজেই তাঁহার সমস্ত দেহ-মন-প্রাণের উপরে, সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের উপরে—নিজের সম্পূর্ণ অধিকার স্থাপন করিল!! এই অধিকারের বলেই রাধাপ্রেম সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ংভগবান্‌কে আপন-ভোলা করিয়া গম্ভীরার ভিত্তিতে নিজের দ্বারা নিজের মুখ ঘষাইয়া ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত করিয়া দিল!!!

প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত রাজ্যের সকলকে যিনি নাচাইতেছেন—কাহাকেও বা বহিরঙ্গা-মায়া-পাশে, কাহাকেও বা অন্তরঙ্গা-যোগমায়া-পাশে আবদ্ধ করিয়া নাচাইতেছেন—রাধাপ্রেম তাঁহাকেই এবার নাচাইতেছেন, বাজিকরের পুতুলের মত। "গুরু নানা ভাবগণ, শিষ্য প্রভুর তনুমন, নানা রীতে সতত নাচায়। নির্ব্বেদ বিষাদ দৈন্য, চাপল্য হর্ষ ধৈর্য্য মন্যু, এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায়॥ ২।২।৬৫॥" আগুন অপরকেই পোড়ায়, নিজেকে পোড়ায় না। কিন্তু রাধাপ্রেম অপরকেও নাচায়, নিজেকেও নাচায়। "কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেম ভক্তেরে নাচায়। আপনি নাচয়ে তিনে নাচে এক ঠাঁয়॥ ৩।১৮।১৭॥ টীকা দ্রষ্টব্য॥"

কোনও কোনও সময়ে শ্রীরাধার প্রেম কৃষ্ণ-বিরহের রাগে রঞ্জিত, মিলনের জন্য উৎকণ্ঠায় ভারাক্রান্ত। কখনও বা প্রভু সেই ভাবে আবিষ্ট। প্রভুর হৃদয়স্থিত এই প্রেম, সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণকে বাহিরে পাওয়ার আশাতেই, বহির্ব্বিকাশের চেষ্টার উদ্দামতায়, বাধাস্বরূপ প্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যেন তাহার পথ হইতে অপসারিত করিবার উদ্দেশ্যেই ভিতর হইতে ঠেলিয়া দলিয়া মথিয়া এমন এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া ফেলে যে, প্রভুর প্রত্যেক অঙ্গগ্রন্থি এক বিতস্তি পরিমাণ শিথিল হইয়া যায়, তাহাতে প্রভুর দেহ প্রায় সাত আট হাত লম্বা হইয়া পড়ে। আবার ঐ প্রেমই সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণকে ভিতরে পাওয়ার আশাতেই, যখন প্রবল বেগে হৃদয়েই কেন্দ্রীভূত হইতে চেষ্টা করে, তখন—প্রবল স্রোতের সঙ্গে ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড যেমন স্রোতের দিকেই আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ এই হৃদয়মুখ-প্রেমের প্রবল আকর্ষণে—প্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও যেন হৃদয়ের দিকেই আকৃষ্ট হইতে থাকে। তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যায়, প্রভুর দেহ কূর্ম্মাকার হইয়া পড়ে। "মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন, গজযুদ্ধে বনের দলন॥ ২।২।৫৫॥" রাধাপ্রেমের এতাদৃশ প্রভাবকে বাধা দিতে বা সম্বরণ করিতে সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণও অসমর্থ।

রাধাপ্রেম নানা ভাবে প্রভুর উপরে তাহার প্রভাব পরিস্ফুট করিয়াছে; প্রভুও তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন।

এইরূপে ব্রজের তিনটী অপূর্ণ বাসনা নবদ্বীপ-লীলায় পূর্ণতা লাভ করিল।

রাগানুগাভক্তি। শ্রীকৃষ্ণের রাগানুগা-ভক্তি-প্রচারের বাসনাও ব্রজলীলায় পূর্ণতা লাভ করে নাই; নবদ্বীপেই তাহারও পূর্ণতা। তাহাই দেখান হইতেছে।

(ক) ভজনের নিমিত্ত যাহাতে জীবের লোভ জন্মিতে পারে, ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ সেই বস্তুটী জীবকে দেখাইয়া যান নাই; সেই বস্তুটীর কথা যাহাতে জীব জানিতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর-রূপে তিনি সেই বস্তুটীর পরিদৃশ্যমান্ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ-সেবানন্দ, লীলারস আস্বাদনের আনন্দ, শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আস্বাদনানন্দ—এই-ই হইল লোভের বস্তু। আনন্দ কিন্তু দেখিবার জিনিস নয়; বাহিরের লক্ষণ দেখিয়া ইহাকে চিনিতে হয়। মুখের প্রফুল্লতা দেখিয়া যেমন অন্তরের সুখ চেনা যায়, তদ্রূপ। কৃষ্ণপ্রেমের যে কি আনন্দ এবং সেই আনন্দের যে কি প্রভাব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর দেহে তাহা সম্যকরূপে প্রকটিত হইয়াছে।

প্রেমানন্দে হাসি, কান্না, নৃত্য, গীত—প্রভু এবং তাঁহার পার্ষদবর্গ সর্ব্বদাই দেখাইয়াছেন। প্রেমানন্দের সাত্ত্বিক বিকার যে এক অদ্ভুত ব্যাপার, তাহা মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে এমন জ্বলন্ত ভাবে আর কেহ দেখাইয়া যান নাই। নয়ন হইতে পিচকারীর ন্যায় অশ্রুধারা, কদম্ব-কেশরের ন্যায় পুলক, বৈবর্ণ্যে স্বর্ণোজ্জ্বল কান্তি মল্লিকা-পুষ্পবৎ শুভ্র হইয়া যাওয়া, কম্পে দন্ত-সব হালিয়া যাওয়া—এসব আনন্দ-বিকার দেখাইয়া পরম-লোভনীয় আনন্দ-বস্তুটীর পরিচয় প্রভু দিয়া গিয়াছেন। "যদি গৌর না হত, কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম দে। রাধার মহিমা, প্রেমরস-সীমা, জগতে জানাত কে॥ মধুর-বৃন্দাবিপিন-কাহিনী প্রবেশ চাতুরী সার। বরজ-যুবতী-ভাবের ভকতি, শকতি হইত কার॥"

(খ) "মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।"—ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ রাগমার্গের ভজনের কেবল উপদেশ মাত্র দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু একটা সর্ব্বচিত্তাকর্ষক আদর্শের অভাবে তাহার অনুসরণে জীব ততটা প্রলুব্ধ হইতে পারে নাই। শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিজে ভজন করিয়া এবং স্বীয় পার্ষদবৃন্দের দ্বারা ভজন করাইয়া ভজনের একটা পরমোজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। অধিকন্তু, স্বীয় পার্ষদবৃন্দের দ্বারা দীক্ষাদি দেওয়াইয়া সেই আদর্শের সঙ্গে এবং স্বীয়-পরিকরবৃন্দের সঙ্গেও পরবর্ত্তী কালের জীবের একটা সংযোগসূত্র প্রভু স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। সেই সূত্রকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান কালের জীবও তাঁহার চরণ-সমীপে পৌঁছিবার সৌভাগ্য পাইতে পারে।

(গ) শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া পরবর্ত্তী কালের জীবের জন্য বিস্তৃত ভজন-প্রণালীর উপদেশও প্রভু কৃপা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পার্ষদবর্গের কৃপায় জীব তাহা এখন পাইয়াছে।

(ঘ) শ্রীকৃষ্ণরূপে দ্বাপরে তিনি ভজনের উপদেশ করিয়াছেন—ব্রজপ্রেম লাভ করার জন্য। কিন্তু ব্রজপ্রেম তিনি তখন জীবকে দেন নাই, প্রেমলাভের উপায়টীর কথামাত্র বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে তিনি যতদিন প্রকট ছিলেন, ততদিন—কোনওরূপ বিচার না করিয়া—আপামর-সাধারণকে ব্রজপ্রেমই দান করিয়া গিয়াছেন। করুণার অপূর্ব্ব বিকাশ। জীবের দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে বুঝা যায়, এ অপূর্ব্ব প্রেমভক্তি-সম্পত্তিটী দেওয়ার জন্যই যেন তিনি কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্॥"

এইরূপে দেখা গেল, যে দুইটী উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাদের সিদ্ধির আরম্ভ ব্রজে, কিন্তু সমুজ্জ্বল পূর্ণতা—নবদ্বীপে।

প্রকট ও অপ্রকট। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, প্রকট-লীলা হইতেই অপ্রকটের পরিচয় পাওয়া যায়। উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল, প্রকট নবদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর হইলেন "রসরাজ মহাভাব দুইয়ে একরূপ।" অপ্রকট-নবদ্বীপেও তাহাই।

রাগমার্গের ভক্তিপ্রচার কেবল প্রকট-লীলারই ব্যাপার; অপ্রকট-লীলায় ভক্তি-প্রচারের অবকাশ নাই; কারণ, অপ্রকট-ধাম সাধন-ভূমিকা নহে, সেখানে মায়াবদ্ধ সাধক জীবেরও অভাব।

প্রকট এবং অপ্রকট—এই উভয় ব্রজ-লীলাতেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের স্বমাধুর্য্যাদির আস্বাদন-বাসনা তিনটী অপূর্ণ থাকে এবং প্রকট ও অপ্রকট এই উভয় নবদ্বীপ-লীলাতেই তাঁহার এই তিনটী বাসনা পূর্ণ হইতে পারে।

সুতরাং বিষয়ত্ব-প্রধানরূপে স্বয়ংভগবানের রসাস্বাদন-বাসনা থাকে অপূর্ণ এবং আশ্রয়ত্ব-প্রাধান্যেই অপূর্ণ-রসাস্বাদন-বাসনার পূর্ণতা।

ব্রজের প্রকটে এবং অপ্রকটে যেরূপ বৈলক্ষণ্য, নবদ্বীপের প্রকটে এবং অপ্রকটেও তদ্রূপই বৈলক্ষণ্য। ব্রজের অপ্রকট-লীলার বিস্তৃতি নবদ্বীপের অপ্রকটে এবং ব্রজের প্রকট-লীলার বিস্তৃতি নবদ্বীপের প্রকটে। নবদ্বীপ-লীলা হইল ব্রজলীলার পরিশিষ্ট-স্থানীয়।

নবদ্বীপ-পরিকর। ব্রজের শ্রীকৃষ্ণই যেমন নবদ্বীপের শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর, তেমনি ব্রজের পরিকরবর্গই নবদ্বীপ-লীলার পরিকররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইরূপে নন্দমহারাজ হইয়াছেন জগন্নাথমিশ্র; যশোদামাতা হইয়াছেন শচীমাতা; ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ-রূপে প্রত্যেকে উভয় ধামেই আছেন।

ব্রজে যাঁহারা কান্তাভাবের পরিকর ছিলেন, তাঁহারা নবদ্বীপলীলায় পুরুষদেহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। নবদ্বীপ-লীলার আর একটী বিশেষত্ব এই যে, ব্রজের একাধিক পরিকরের ভাব নবদ্বীপে একই পরিকরে আছে; আবার ব্রজের একই পরিকরের ভাবও নবদ্বীপে একাধিক পরিকরে দৃষ্ট হয়। শ্রীরাধার ভাব গৌরেও আছে এবং গদাধর-পণ্ডিত গোস্বামীতেও আছে। গদাধর-পণ্ডিতে শ্রীরাধার ভাবও আছে, ললিতার ভাবও আছে।

ব্রজের বলদেবই নবদ্বীপের শ্রীনিত্যানন্দ; শ্রীনিত্যানন্দে শ্রীরাধার ভগিনী শ্রীমতী অনঙ্গমঞ্জরীর ভাব আছে বলিয়াও কেহ কেহ বলেন।

ব্রজলীলা ব্যতীত অন্যলীলার পরিকরও নবদ্বীপলীলায় আছেন। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর যে অংশ গুণমায়াকে জগতের উপাদানযোগ্যতা দান করেন, (অর্থাৎ যে অংশ জগতের মুখ্য উপাদান), সেই অংশই শ্রীঅদ্বৈত। শ্রীঅদ্বৈতে ব্রজের এক মঞ্জরীর ভাব আছে বলিয়াও কেহ কেহ বলেন। আবার তাঁহাতে সদাশিবও অন্তর্ভুক্ত আছেন।

শ্রীমুরারিগুপ্ত শ্রীরামের সেবক হনুমান। শ্রীবাসপণ্ডিত নারদ-স্বভাব। শ্রীলহরিদাসঠাকুরে প্রহ্লাদ এবং ব্রহ্মা। ইত্যাদি।

গৌর-করুণা। নবদ্বীপ-লীলাতেই ভগবৎ-করুণা-বিকাশের সর্ব্বাতিশায়ী উৎকর্ষ। এই উৎকর্ষ দুইদিক দিয়া—মাধুর্য্যে এবং উল্লাসে।

(ক) করুণার মাধুর্য্য। করুণা স্বতঃই মধুর—বিষয় এবং আশ্রয়, উভয়ের পক্ষেই মধুর। অন্যান্য অবতারে ভগবান্ অসুর-সংহার করিয়াছেন—অসুরের প্রাণ বিনাশ করিয়া। ইহাও অসুরের প্রতি তাঁহার করুণা; যেহেতু, হতারি-গতিদায়ক ভগবান্ নিহত অসুরকে স্বচরণে স্থান দিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাণবিনাশের ফলে যে অসুরের এই সৌভাগ্য লাভ হইল, দেহে প্রাণ থাকিতে অসুর তাহা বুঝিতে পারে নাই, তাহার বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়-স্বজনগণ তাহার প্রাণবিনাশের পূর্ব্বে এবং পরেও এই করুণার কথা জানিতে পারে নাই; সুতরাং এই করুণার মাধুর্য্য তাহারা অনুভব করিতে পারে নাই এবং প্রাণবিনাশের পূর্ব্বে অসুরও তাহা পারে নাই।

কিন্তু গৌর-অবতারে ভগবান্ কোনও অস্ত্রধারণ করেন নাই। অসুর-সংহার তিনি এই অবতারেও করিয়াছেন—কিন্তু প্রাণবিনাশের দ্বারা নহে, পরন্তু অসুরত্ব-বিনাশের দ্বারা। নাম-প্রেম বিতরণদ্বারা প্রভু যেই মুহূর্ত্তে অসুরের কুপ্রবৃত্তি এবং কুপ্রবৃত্তির মূল মায়াকে দূরীভূত করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই সেই অসুর হইয়া গেলেন কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত মহাভাগবত। অসুরের প্রতি এই করুণার মাধুর্য্য কেবল যে অসুরই আস্বাদন করিলেন, তাহাই নহে; সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার আত্মীয়-স্বজন এবং অপরাপর জন-সাধারণও করুণার এই মাধুর্য্যের আস্বাদন পাইয়া ধন্য হইয়া গেলেন। "রাম-আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধ'রে, অসুরেরে করিল সংহার। এবে অস্ত্র না ধরিল, প্রাণে কারে না মারিল, চিত্তশুদ্ধি করিল সভার॥" গৌর-করুণার এই অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আপামর-সাধারণকে তাঁহার চরণের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে।

(খ) **করুণার উল্লাস।** গৌর-অবতারেই ভগবৎ-করুণার সর্ব্বাতিশায়ী উল্লাস বা বিকাশ। তাহার প্রমাণ এই যে—অনাসঙ্গ-সাধনে যাহা কিছুতেই পাওয়া যায় না, সাসঙ্গ-সাধনেও যাহা সহজে পাওয়া যায় না—যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা থাকে, সে পর্য্যন্ত যাহা পাওয়া যায় না, কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান-মার্গের সাধনেও যাহা পাওয়া যায় না—এতাদৃশ সুদুর্ল্লভ প্রেমভক্তি শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যোগ্যতা-অযোগ্যতাদি সম্বন্ধে কোনওরূপ বিচার-বিবেচনা না করিয়া যেখানে-সেখানে যাহাকে-তাহাকে দান করিয়া গিয়াছেন।

গৌর-করুণার আর এক অপূর্ব্ব বিকাশ দৃষ্ট হয় প্রভুর নাম-বিতরণের ব্যাপারে। নাম চারিযুগেই প্রচলিত। ঋগ্‌বেদে এবং শ্রুতিতেও নাম-মাহাত্ম্যের কথা এবং নাম-নামীর অভেদের কথা দৃষ্ট হয় (১।১৭।১৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। অন্যান্য যুগেও যুগাবতারাদি দ্বারা জীবের মধ্যে নাম বিতরিত হইয়াছে। কিন্তু এই কলিযুগব্যতীত অন্য কোনও সময়েই স্বয়ংভগবান্ নিজে নাম কীর্ত্তন করিয়া নিজে আস্বাদন করিয়া বিতরণ করেন নাই। প্রেমঘন-বিগ্রহ, মাধুর্য্য-ঘনবিগ্রহ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে উদ্‌গীর্ণ এই নাম, স্বভাবতঃ পরম মধুর হইলেও, একটা অপূর্ব্ব অতিরিক্ত মাধুর্য্য-মণ্ডিত হইয়াই বাহির হইয়া আসিয়াছে। ক্ষীরের পিষ্টক স্বভাবতঃই মধুর; তার ভিতরে যদি অমৃতের পুর দেওয়া যায়, তাহার মাধুর্য্যের চমৎকারিতা অনেক বর্দ্ধিত হয়। পরম-মধুর নামের মধ্যে প্রেমামৃতের পুর দিয়া প্রভু এই নামের মাধুর্য্য-চমৎকারিতা সর্ব্বাতিশায়িরূপে বাড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। ইহা গৌর-করুণার এক অপূর্ব্ব উল্লাস।

আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা নামের এই মাধুর্য্যের অনুভব পাইনা। পিত্তদগ্ধ ব্যক্তি মিশ্রীর মিষ্টত্বও অনুভব করিতে পারে না; কিন্তু মিশ্রী খাইতে খাইতে যখন পিত্তদোষ কাটিয়া যায়, তখন সে আর মিশ্রী ছাড়িতে পারেনা। আমাদের চিত্তও বহির্ম্মুখতারূপ পিত্তদোষে দূষিত, ঔষধও নামই। নাম করিতে করিতে যখন চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইয়া যাইবে, তখনই বুঝা যাইবে, এই নাম—"আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং সর্ব্বাত্মস্নপনম্।" এবং তখনই বুঝা যাইবে, দেবী পৌর্ণমাসী কেন বলিয়াছিলেন "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্॥ চেতঃ-প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী॥"

উল্লাস-শব্দের আর একটী অর্থ আছে—আনন্দের আতিশয্য-জনিত উচ্ছ্বাস। লোক যখন তাহার অভীষ্টবস্তু আশাতিরিক্তরূপে পায়, তখনই তাহার উল্লাস জন্মে। ভগবৎ-করুণাও গৌরের নিকট হইতে আশাতিরিক্ত অভীষ্ট একটী বস্তু পাইয়াছে, তাই করুণার উল্লাস। ভগবৎ-করুণা সর্ব্বদাই যেন উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে—নির্ব্বিচারে জীবকে কৃতার্থ করার জন্য। করুণা কোনওরূপ বিচারের পক্ষপাতী নয়, ন্যায়পরায়ণতাই বিচারের পক্ষপাতী। যাহা হউক, ভগবৎ-করুণার এইরূপ স্বভাব হইলেও তাহার একটা অপেক্ষা আছে—ভগবানের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত পাইলেই তিনি সেই ইঙ্গিতকে বাহন করিয়া জীবের দিকে ছুটিতে পারেন। নবদ্বীপ-লীলায় প্রভুর সঙ্কল্পই ছিল আপামর-সাধারণকে কৃপা করা, ইহাই করুণার অভীষ্ট। কিন্তু প্রভুর সঙ্কল্পের ব্যাপকতা আরও অনেক বেশী,—আপামর সাধারণকে নির্ব্বিচারে চরম-তম এবং পরম-তম বস্তুটী দেওয়া, প্রেমভক্তি দেওয়া। ইহা ছিল বোধ হয় করুণার পক্ষে আশার অতিরিক্ত। প্রভুর এই বিরাট সঙ্কল্প—আপামর সাধারণকে প্রেমভক্তি দানের সঙ্কল্প—হইল এবার করুণার বাহন। এই সঙ্কল্পদ্বারা প্রভু যেন করুণাকে বলিলেন—"করুণা, আমি আমাকে সম্পূর্ণরূপে তোমার হাতে ছাড়িয়া দিলাম। যেখানে ইচ্ছা, যাহার নিকটে ইচ্ছা—তুমি আমাকে বিনামূল্যেই বিলাইয়া দিতে পার। এবার তোমার অবাধ স্বাতন্ত্র্য।" এই অবাধ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া করুণার যেন আনন্দের আর সীমা রহিল না। অন্যান্য লীলায় করুণা থাকে ভগবানের অধীন, এবার ভগবান্ হইলেন করুণার অধীন। তাই দেখা গিয়াছে, গৌরের অনুসন্ধান ব্যতীতও তাঁহার কৃপা জীবকে কৃতার্থ করিয়াছেন; যেমন বাণীনাথ-পট্টনায়কে। তাই বলা হয় "এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল। তাঁর অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল॥"

এই অবাধ স্বাতন্ত্র্য পাইয়াই গৌর-করুণা প্রভুর প্রকটকালে প্রেমভক্তি দিয়া সকলকে কৃতার্থ করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তীকালের জীবের কল্যাণার্থ রায়-রামানন্দ এবং শ্রীরূপ-সনাতনাদিকে উপলক্ষ্য করিয়া রাধাভাবের নিবিড় আবেশময় প্রভুর দ্বারাও বিবিধ তত্ত্বকথা প্রকাশ করাইয়াছেন।

গৌরের সর্ব্বাতিশায়ী মাধুর্য্য। "স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত যঃ। যেনাসীৎ জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ॥ ১।১৩।১॥" এই শ্লোক হইতে জানা যায়, রথের সম্মুখে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যে ভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া—রথযাত্রা উপলক্ষ্যে যত লোক শ্রীক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন, এমন কি স্বয়ং জগন্নাথও বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কেন? যাহা কখনও দেখা যায় নাই; কিম্বা যাহার কথাও কখনও শুনা যায় নাই, কি কল্পনাও করা যায় নাই, এমন কোনও ব্যাপার দেখিলেই লোকের বিস্ময় জন্মে। প্রভুর নৃত্যের মধ্যে এমন কি বস্তু ছিল, যাহা কেহ কখনও দেখেন নাই? পরবর্ত্তী বর্ণনায় প্রভুর এই নৃত্যসম্বন্ধে দুইটী বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—তাঁহার অত্যুদ্দণ্ড তাণ্ডবনৃত্য (২।১৩।৭৭-৭৮) এবং তাঁহার স্বাত্ত্বিক বিকারের অদ্ভুত বিকাশ (২।১৩।৯৬-১০৬)। নৃত্যকালে অতিক্রুত ভ্রমণে একটী স্বর্ণবর্ণ চক্রের প্রতীতি জন্মাইতেছেন, উদ্দণ্ডনৃত্যে সসাগরা মহী টলমল করিতেছে, কখনও অদ্ভুত লম্ফে বহুদূর ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছেন, কখনও বা আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছেন—ইহাতে সকল লোকেরই বিস্মিত হওয়া সম্ভব; কেননা, লোকসমাজে—ভক্তসমাজেও—এইরূপ নৃত্য কেহ কখনও দেখেন নাই। আবার, একই সময়ে অশ্রু-কম্প-পুলকাদি অষ্ট-সাত্ত্বিকের অদ্ভুত বিকাশ—নয়ন হইতে পিচকারীর ন্যায় জলের ধারা অতি জোরে বাহির হইতেছে, তাহাতে আশে-পাশের সমস্ত লোক ভিজিয়া যাইতেছে (অশ্রু), সুগৌর দেহ কখনও রক্তের ন্যায় লাল—কখনও বা মল্লিকা-পুষ্পের মতন সাদা হইতেছে (বৈবর্ণ্য), গায়ের রোম খাড়া হইয়া গিয়াছে—গোড়া ফোঁড়ার মত ফুলিয়া উঠিয়াছে (পুলক), দাঁতগুলি খট্ খট্ করিয়া যেন পড়িয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে (কম্প), দেহের সমস্ত অংশ হইতে তীব্রবেগে ঘাম ছুটিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে রক্তও বাহির হইয়া আসিতেছে (প্রস্বেদ), স্পষ্ট করিয়া কোনও শব্দ উচ্চারণ করিতে পারেন না—জগন্নাথ বলিতে যাইয়া কেবল জ-জ-গ-গই বলিতেছেন (স্বরভেদ), কখনও শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া থাকেন—হস্ত-পদাদি অচল (স্তম্ভ), আবার কখনও বা শ্বাস-প্রশ্বাসহীন ভাবে ভূমিতে পড়িয়া থাকেন (প্রলয়)—এমন সব অদ্ভুত বিকার। ইহাতেও সমস্ত লোক বিস্মিত হইতে পারেন; কারণ, এরূপ বিকার কেহ কখনও দেখেন নাই, দেখার কল্পনাও কেহ করিতে পারেন নাই। প্রভু যখন সর্ব্বপ্রথমে শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন, সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যও তখন বিস্মিত হইয়াছিলেন; প্রভুর দেহে তিনি তখন যে প্রেমবিকার দেখিয়াছিলেন, শাস্ত্রজ্ঞ সার্ব্বভৌম গ্রন্থে সে সমস্ত বিকারের কথা পড়িয়াছিলেন—কিন্তু কখনও কাহারও মধ্যে দেখেন নাই।

যাহা হউক, প্রভুর উদ্ভট নৃত্য এবং অদ্ভুত সাত্ত্বিক বিকার দেখিয়া তত্রত্য লোক সকলের ন্যায় শ্রীজগন্নাথেরও কি বিস্ময় জন্মিয়াছিল? তিনি কি প্রভুর স্বরূপ চিনিতে পারেন নাই? না পারিয়া থাকিলে অবশ্যই তাঁহারও বিস্মিত হওয়ার সম্ভাবনা। তিনি প্রভুর স্বরূপতত্ত্ব জানিতেন কিনা, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ শ্রীগ্রন্থে পাওয়া যায় না। তবে একটা অনুমান করা চলে। শ্রীজগন্নাথ হইলেন দ্বারকাবিহারী শ্রীকৃষ্ণ। প্রকটলীলায় রাসবিলাসী ব্রজেন্দ্র-নন্দনই রাসাদিবিলাসের পরে ব্রজ হইতে মথুরা-দ্বারকায় গিয়াছিলেন। সুতরাং প্রকটলীলায় দ্বারকা-বিহারী ব্রজবিলাসী ব্রজেন্দ্র-নন্দন হইলেও তাঁহাতে ব্রজেন্দ্রনন্দনের ন্যায় প্রেমমুগ্ধত্ব বা নিজের স্বরূপ-জ্ঞানের প্রচ্ছন্নত্ব সম্যক্ ছিল না। সুতরাং তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বও সম্যক্ রূপে প্রচ্ছন্ন ছিলনা বলিয়া অনুমান করা যায়। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহাও অনুমান করা যায় যে, তিনি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের তত্ত্ব—শ্রীশ্রীগৌর যে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত-শ্রীকৃষ্ণ, ইহাও তিনি—জানিতেন। ইহাই যদি হয়—তাহা হইলে প্রভুর দেহে অদ্ভুত স্বাত্ত্বিক বিকার দেখিয়া অন্যান্য লোকের ন্যায় তাঁহার বিস্ময়ের বিশেষ কারণ ছিল বলিয়া মনে করা যায় না। তিনি দ্বারকাবিহারী হইলেও প্রকটলীলায় দ্বারকায় অবস্থান কালেও ব্রজলীলার কথা তাঁহার মনে পড়িত এবং

স্বপ্নাদিতে রাধা-রাধা বলিয়া উঠিতেন বলিয়াও শুনা যায়। সুতরাং শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীদিগের সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বিকার এবং রাসলীলার সর্ব্বাতিশায়ী নৃত্য-কৌশলও তাঁহার অপরিচিত ছিল বলিয়া মনে হয় না।

পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে মহাপ্রভুর নৃত্যপ্রসঙ্গে কবিরাজ-গোস্বামী যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে সমবেত জনগণের বিস্ময়ের কথাই লিখিয়াছেন, আর শ্রীজগন্নাথের "অপার-আনন্দের" কথাই লিখিয়াছেন—বিস্ময়ের কথা লিখেন নাই (২।১৩।৯৩)। কিন্তু প্রারম্ভ-শ্লোকে যে জগন্নাথের বিস্ময়ের কথা লিখিয়াছেন, তাহাও মিথ্যা নয়। ইহার সমাধান বোধ হয় এইরূপ। প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য এবং অদ্ভুত সাত্ত্বিক বিকার দেখিয়া জনগণের আনন্দ অপেক্ষা বিস্ময়ই জন্মিয়াছিল বেশী; তাঁহাদের এই বিস্ময় বোধ হয় অধিকক্ষণই স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল; তাঁহাদের মধ্যে বিস্ময়েরই আধিক্য ছিল বলিয়া কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহাদের কেবল বিস্ময়ের কথাই লিখিয়াছেন। কিন্তু উক্ত নৃত্যে এবং সাত্ত্বিক-বিকারে শ্রীজগন্নাথের বিস্ময়ের বিশেষ হেতু না থাকারই সম্ভাবনা—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। নৃত্যের উদ্দণ্ডতা এবং প্রেমবিকারের অদ্ভুতত্ব ব্যতীত শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে অন্য কিছু একটা অদ্ভুত বস্তু দেখিয়াছিলেন—যাহাতে তাঁহার বিস্ময় এবং আনন্দ দুই-ই জন্মিয়াছিল; কিন্তু বিস্ময় অপেক্ষা আনন্দেরই ছিল অনেক আধিক্য; অদ্ভুত বস্তুর দর্শনজনিত বিস্ময়—কিন্তু তাহা ছিল ক্ষণস্থায়ী; সেই বস্তুর অনুভবজনিত আনন্দের প্রবল প্রবাহে বিস্ময় বহু দূরে অপসারিত হইয়া গিয়াছিল, আনন্দই স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল। তাই পরবর্ত্তী পয়ারে কবিরাজ-গোস্বামী জগন্নাথের বিস্ময়ের কথা না লিখিয়া আনন্দের কথাই লিখিয়াছেন; যাঁহার মধ্যে যে ভাবটী অধিকক্ষণ স্থায়িত্বলাভ করিয়াছিল, তাহার উল্লেখেই প্রাধান্য দিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথের আনন্দ এত অধিক হইয়াছিল যে, তিনি এই আনন্দ আস্বাদনের লোভ যেন সম্বরণ করিতে পারেন নাই; তাই মাঝে মাঝে রথ থামাইয়াও অনিমেষ-নেত্রে প্রভুর নৃত্যদর্শন করিতেন (২।১৩।৯৪); আবার কখনও বা প্রভুকে সাক্ষাতে দেখিতে না পাইলে—সেই অদ্ভুতবস্তুটীর দর্শনজনিত আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইলেন বলিয়াই বোধ হয় ব্যাকুলতাবশতঃ রথ চালাইবার ইচ্ছা তাঁহার স্তম্ভিত হইয়া যাইত—রথ স্থির হইয়া থাকিত (২।১৩।১১৩); আবার গৌর যখন সাক্ষাতে আসিতেন, তখন সেই অদ্ভুত বস্তুটীর আস্বাদন করিতে করিতেই যেন ধীরে ধীরে রথ চালাইতেন।

কিন্তু সেই অদ্ভুত বস্তুটী কি—যাহার দর্শনে জগন্নাথের বিস্ময় ও অত্যধিক আনন্দ জন্মিয়াছিল? কোনও পাত্রে যদি কোনও গরম জিনিস থাকে, সেই পাত্রের বহির্ভাগও উত্তপ্ত হয়; ভিতরের তাপ যত বেশী হইবে, বাহিরের তাপও তত বেশী হইবে; এই বাহিরের তাপ হইল—পাত্রের উপরে ভিতরের তাপের ক্রিয়া। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভিতরে ছিল পরম-পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত কৃষ্ণপ্রেম; শ্রীশ্রীজগন্নাথের বদনচন্দ্র দর্শনে তাহা উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল—উদ্দণ্ডনৃত্য এবং সুদীপ্ত সাত্ত্বিক-বিকারাদি হইল প্রভুর দেহের উপরে—প্রেমের আশ্রয়ের উপরে প্রেমের ক্রিয়া। প্রেমের বিষয়ের উপরেও প্রেমের একটী বিশেষ ক্রিয়া আছে। পরমপ্রেমবতী শ্রীরাধা যখন শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে থাকিতেন, তখন তাঁহার প্রেমের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য বহুগুণে বর্দ্ধিত হইত; আবার এই বর্দ্ধিত মাধুর্য্য দেখিয়া শ্রীরাধার প্রেম এবং উল্লাসও বর্দ্ধিত হইত; আবার শ্রীরাধার এই বর্দ্ধিত প্রেমোল্লাস দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আরও বর্দ্ধিত হইত—প্রেম ও মাধুর্য্য পরস্পরে যেন হুড়াহুড়ি করিয়াই বর্দ্ধিত হইত, কেহই পশ্চাদ্‌পদ হইত না; তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম, দোঁহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহো নাহি হারি॥ ১।৪।১২৪॥ তখন শ্রীকৃষ্ণের এই মাধুর্য্য দেখিয়া সর্ব্বমনোমোহন মদনও মুগ্ধ হইয়া যাইত। রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ॥ কিন্তু রাধাবিরহিত কৃষ্ণেরও যে স্বাভাবিক মাধুর্য্য, তাহাও—স্বস্য চ বিস্মাপনং—আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর—অপরকে তো বিস্মিত করিতই, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও তাহা দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতেন। দ্বারকায় শ্রীরাধা ছিলেন না, সেখানেও মণিভিত্তিতে নিজের রূপ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিস্মিত হইয়াছিলেন, নিজের রূপের মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য—শ্রীরাধা যেভাবে আস্বাদন করেন, সেইভাবে আস্বাদনের জন্য—লুব্ধ হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনের নিভৃত নিকুঞ্জে শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রেমে গলিয়া গলাগলি হইয়া একাসনে বসিয়া যখন রহস্যালাপ করিতেন, তখন তাঁহাদের সম্বর্দ্ধিত মাধুর্য্যসম্ভার দেখিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ মাধুর্য্য তাঁহাদিগকে

অনুভব করাইবার উদ্দেশ্যে কোনও কৌতুকিনী কুঞ্জসেবিকা সম্ভবতঃ কোনও সময়ে তাঁহাদের সাক্ষাতে দর্পণ ধরিয়া থাকিবেন। সেই দর্পণে নিজের রূপ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহা তিনিই জানেন। সেই অবস্থার ফলেই বোধ হয় জগদ্‌বাসী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। যাহা হউক, শ্রীরাধার সান্নিধ্যের নিবিড়তা যত বেশী হইবে, বোধ হয়, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যও তত বেশী স্ফুরিত হইবে। শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামসুন্দরের সম্মিলিত বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে এই নিবিড়তা যত বেশী, তত বেশী ব্রজেও সম্ভব হয় নাই। ব্রজে শ্রীরাধার অভিলাষ হইয়াছিল—নিজের প্রতি অঙ্গ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে আলিঙ্গন করিতে। "প্রতি অঙ্গ লাগি মোর প্রতি অঙ্গ ঝুরে।" কিন্তু ব্রজে তাঁহার এই অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। নবদ্বীপ-লীলায় নবগোরোচনা-গৌরী ভানুনন্দিনী যেন প্রেমে গলিয়া নিজের প্রতি অঙ্গ দ্বারা স্বীয় প্রাণবল্লভের প্রতি অঙ্গকে আলিঙ্গন দ্বারা আবৃত করিয়া, স্বীয় চিত্তের প্রেম-পরাকাষ্ঠা দ্বারা প্রাণবঁধুয়ার চিত্তকে সম্যক্‌রূপে অনুরঞ্জিত ও পরিষিঞ্চিত করিয়া শ্যামসুন্দরকে গৌরসুন্দর সাজাইয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আছে, শ্রীরাধার মাধুর্য্য আছে, উভয়ের নিবিড়তম সান্নিধ্য বশতঃ হুড়াহুড়ি করিয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান উভয়ের সম্মিলিত মাধুর্য্যের অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বাতিশায়িত্ব আছে; এই সর্ব্বাতিশায়ী মাধুর্য্যের অনুভবজনিত যে আনন্দ, তাহাও নদীয়া-লীলাতেই সর্ব্বাতিশায়ী, ব্রজেও বোধ হয় ইহা অপরিচিত ছিল। তাহার সাক্ষী ভাগ্যবান্ রায়রামানন্দ। তিনি প্রথমে সন্ন্যাসী গৌরকে দেখিলেন, দেখিয়া তাঁহার আনন্দও হইয়াছিল; কিন্তু সেই আনন্দে তিনি মূর্চ্ছিত হন নাই। তার পরে, সন্ন্যাসি-রূপের পরিবর্ত্তে দ্বিভুজ-মুরলীধর-নবকিশোর-নটবর শ্যামসুন্দরকে দেখিলেন, দেখিয়া আনন্দিতও হইলেন; কিন্তু সেই আনন্দেও তিনি মূর্চ্ছিত হন নাই। তারপরে, সেই শ্যামসুন্দরের সাক্ষাতে কাঞ্চন-পঞ্চালিকাতুল্য ভানুনন্দিনীকেও দেখিলেন এবং তাঁহার গৌরকান্তির ছটায় শ্যামসুন্দরের সমস্ত শ্যাম অঙ্গকে গৌরবর্ণ হইতে দেখিলেন, তাহাতেও তাঁহার প্রচুর আনন্দ হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতেও তিনি মূর্চ্ছিত হন নাই। ইহার পরে প্রভু কৃপা করিয়া যখন রামরায়কে প্রভুর নিজ স্বরূপ—রসরাজ-মহাভাব দুয়ে একরূপ—দেখাইলেন, আনন্দাধিক্যে রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ২।৮।২৩৩-৩৪॥ এই রসরাজ-মহাভাবের মিলিত স্বরূপই গৌরের প্রকৃত-স্বরূপ। রথাগ্রে নৃত্যকালে শ্রীশ্রীজগন্নাথ বোধ হয় এই রূপেরই দর্শন পাইয়াছিলেন, দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন; কারণ, উহা ছিল—দ্বারকাবিহারী জগন্নাথের অপরিচিত। এক পরমাদ্ভুত-রূপ এবং এই রূপের সর্ব্বাতিশায়ী মাধুর্য্যের অনুভবে তাঁহার এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দও জন্মিয়াছিল—যাহার লোভ তিনি সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

রায়রামানন্দ ছিলেন ব্রজের বিশাখা সখী; যদ্দ্বারা মাধুর্য্যের পূর্ণতম অনুভব ও আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে, কৃষ্ণপ্রেমের চরমতম পরিণতি মাদনাখ্য মহাভাব তাঁহার মধ্যে ছিল না; তথাপি তিনি রসরাজ-মহাভাব-দু'য়ে এক-রূপের মাধুর্য্য দেখিয়া আনন্দাধিক্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর যিনি সেই মাদনাখ্য মহাভাবের পূর্ণতম ভাণ্ডারকেই নিজস্ব করিয়া গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই ভাবের পূর্ণতম উল্লাসের সময়ে তিনি যদি একবার স্ব-স্বরূপের রূপ দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার কি অবস্থা হইত, তিনিই বলিতে পারেন। ভাবাবেশে প্রভুর কূর্ম্মাকার-ধারণ, হস্তপদের গ্রন্থিসমূহের প্রত্যেকের বিতস্তি-পরিমাণ শৈথিল্য—স্বীয় মাধুর্য্য অনুভবেরই ফল কিনা—কে বলিবে?

———